হীরা পান্না

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম সাহিত্য প্রকাশ মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৬৫

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : শতদল ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : স্টার প্রিন্টিং প্রেস : ২১/এ, রাধানাথ বোস লেন : কলিকাতা-৮

হীরা পান্না

লেখকের কয়েকখানি বই

ধাত্রীদেবতা
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গণদেবতা
পঞ্চগ্রাম
মন্বন্তর
আরোগ্য নিকেতন
কবি
সপ্তপদী
নাগিনী কন্যার কাহিনী
কালিন্দী
মহাশ্বেতা
ফরিয়াদ

॥ এক ॥

কাজ করছিলাম। বই ওল্টাচ্ছিলাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার। একটি কাহিনীর উপাদানের জন্য ইতিহাসেব অধ্যায় খুঁজছিলাম। টেলিফোনটা বেজে উঠল। তিক্ত মনেই টেলিফোন তুললাম। একটি কাহিনী যেন মনে মনে বীজ ফেটে অঙ্কুরের মত দুটি দল মেলছিল। বিবর্ণ দুটি দল তাও মাটিব তলায়। আবার যেন মাটি চাপা পড়ে গেল।

—হ্যালো।—

—ফাইভ সিক্স থ্রি জিরো সেভেন সিক্স?

—হ্যাঁ।

......এ'র সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

—আমিই কথা বলছি।

—দেখুন আমি .....হাসপাতাল থেকে কথা বলছি।

একটু চমকে উঠলাম। হাসপাতাল থেকে কথা বলছে! কই পরিচিত আত্মীয়রা কেউ হাসপাতালে যে আছেন বলে তো জানি না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। এ্যাক্সিডেন্ট? এ্যাক্সিডেন্ট কথাটাই স্বাভাবিকভাবে মনের মধ্যে একটা নখওয়ালা ছোট জন্তু লাফিয়ে পড়ার মত যেন ঝপ করে লাফিয়ে পড়ল। নখ ফুটে গেল। পরক্ষণেই মনে হল—না—! এতো টি-বি হসপিটাল। মন অধিকতর চঞ্চল হয়ে উঠল। আমার আপনজনের মধ্যে কেউ—? চিন্তাটা শেষ হবার আগেই ওদিক থেকে কথা ভেসে এল—আপনি কি স্বরূপা ব্যানার্জীকে জানেন?

—স্বরূপা ব্যানার্জী? কে?

—ফিল্ম এ্যাকট্রেস!

—ফিল্ম একট্রেস—সুরূপা ব্যানার্জী? হ্যাঁ—একবার তিনি আমার কাছে একটা গল্প লেখাবার জন্যে কয়েকদিন এসেছিলেন।

—হ্যাঁ; তিনি হাসপাতালে রয়েছেন অবস্থা খারাপ। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন—বারবার বলেছেন। আমরা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। ঘুম ভাঙলেই বলছেন—আপনার কথা। ঘণ্টা দুয়েক পর ঘোরটা কাটার সম্ভাবনা আছে। আপনি কি আসবেন?

ফোনটা ধরেই চিন্তা করে নিলাম। বছর দুয়েক আগে সুরূপা এসেছিল আমার কাছে। কয়েকদিনই এসেছিল। একটু চেষ্টাও করেছিল আত্মীয় বা অন্তরঙ্গ হবার জন্য। কিন্তু আমার নিস্পৃহতার জন্য সেটা সম্ভবপর হয়নি, উৎসাহ সে বজায় রাখতে পারে নি।

—আপনি কি আসবেন? ফোনের ওদিক থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

—দু-ঘণ্টা পর?

হ্যাঁ। অবশ্য আড়াই ঘণ্টাও হতে পাবে। সেক্ষেত্রে একটু বসতে হবে। উনি খুব ব্যগ্র কিন্তু। দ্বিধার মধ্যেই বললাম—আচ্ছা যাব!

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সুরূপা ফিল্ম অভিনেত্রীর কি কথা আমার সঙ্গে থাকতে পারে? ভেবে পেলাম না। সে আমার কাছে এসেছিল গল্প কিনতে নয়, বরাত মত গল্প লেখাতে। আমি লিখিনি। কয়েকদিনই এসেছিল, সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল—কিন্তু সে অনুরোধ রাখা তো সম্ভবপর হয়নি আমার পক্ষে। প্রথম দিন প্রত্যাখ্যান করেছিলাম সস্নেহ মিষ্ট কথায়। তবু সে নিরস্ত হয়নি। একবার আবদারের সুরেই বলেছিল—না, না; বললে আমি শুনবনা। সম্ভবত সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র—এই সত্যটা সম্পর্কে সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী ছিল।

ঘটনাটা মনে পড়ছে। বছর দুয়েক আগে—যথানিয়মে সকালবেলা লিখতে বসেছি—এমন সময় ছোট নতুন একখানা মোটরকার এসে থামল বাড়ির সামনে দেবদারু গাছটার ছায়ায়। জানালাটার মধ্য দিয়ে তাকিয়েছিলাম মোটর থামার শব্দে। কে এল?

দেখলাম দুটি পুরুষ ও একটি সুন্দরী তরুণী। পুরুষদের মধ্যে একজন প্রবীণ একজন তরুণ। মেয়েটির বেশভূষায় প্রসাধনে পারিপাট্যে একটা ঝলমলে দীপ্তি রয়েছে, যা সচরাচর বা সাধারণ নয়। সব থেকে যেটা বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করল—সেটি তার শ্যাম্পুকরা রেশমের মত চুলে একটা এলোমেলো অবিন্যস্ততার পরিপাটি বিন্যাস এবং তার চোখ ও নাক। নাকটির গড়ন বাঁকা? যেটা রূপের ব্যাকরণশাস্ত্রে মস্ত একটা খুঁত। এবং ও নাকের বাঁকা ভাবের জন্যই চোখ দুটিডাগর। টানা নয়—গোলালো। এটাওখুঁত। কিন্তু এই দুটোই তাকে যেন অধিকতর আকর্ষণীয়া করে তুলেছে। পেঁচিয়েপরা ফিকে নীলরংয়ের আঁটোছাঁদো শাড়ীর আঁচলখানি। আলগা হয়ে পিঠের দিকে ঝুলছে ব্রোচ বা পিন দিয়ে আঁটা নেই এর জন্য শাড়ীর আঁচল-খানা কোমরে বেড় দিয়ে সামনে এনে গুঁজে গিঁঠ দিয়ে বাঁধা। যাতে মেয়েটিকে একটু শক্তপোক্ত কাজের মেয়েবাএকটু উদ্ধত মনে হচ্ছিল।

পুরুষদের দুজনেই প্যান্ট এবং সার্ট পরা। এক জনের হাফসার্ট অন্য জনের হাওয়াই সার্ট। তাও বেশ ছাপছোপ দেওয়া। এসে বাড়ির ফটকে ঢুকলেন। আমার ঘরের সামনে বসবার ঘরে। মাঝে একটা দরজা বন্ধই থাকে। ভাইপো এসে খবর দিলে ফিল্ম ডিরেক্টর মহিম-বাবু আর সুরূপা ব্যানার্জী ফিল্ম এ্যাক্ট্রেস এসেছেন। দেখা করবেন।

বললাম—ভিতরে নিয়ে এস।

বাইরের ঘর আর আমার লেখবার ঘরের মধ্যের দরজাটা খুলে দিলে ভাইপো এবং ওঁদের বললে—ভিতরে আসুন।

তাঁরা দরজার মুখে থমকে দাঁড়ালেন। আমার ঘরের ভিতরের ব্যবস্থাটা আধুনিক নয় পুরোনো কালের মত আমি নিজে আসনে বসে ডেস্কের উপর লিখি। সামনে গদীর উপর চাদর পেতে ফরাস করা আছে। তার পাশে দেওয়াল ঘেঁসে একখানা বেঞ্চির মতও আছে— কোটপ্যান্টধারীদের জন্য। কিন্তু তার জন্য বোধ হয় তাঁরা থমকে দাঁড়াননি। দাঁড়িয়েছিলেন ঐ মেয়েটির জন্য। কারণ মেয়েটি

দাঁড়িয়ে আমাকে একদৃষ্টে দেখছিল।

আমার মধ্যে দেখবার কিছু নেই। আমি প্রায় বৃদ্ধ তার উপর শীর্ণদেহ কালো মানুষ। তার দেখার যদি কিছু থাকে তবে আমার আসল চেহারা আর তার মনে গড়ে নেওয়া চেহারার মধ্যে যেটা গরমিল সেইটি যাচাই করে দেখা। এমন হয়। অনেকের আশাভঙ্গ হয়ে থাকে। চুরি করে পেয়েই থাকি আর সত্য প্রাপ্য হিসেবে পেয়েই থাকি—প্রতিষ্ঠা তো কিছুটা পেয়েছি। তার ফলে অনেকেই নামের মোহে মুগ্ধ হয়ে থাকেন। এবং একটা ছবিও কল্পনায় তৈরী করে নেন। কাগজে-পত্রে যে ছবি বেরিয়ে থাকে—সেগুলিও এই ভুল ছবি গড়তে সাহায্য করে। কারণ ফটোগ্রাফ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঘটন ঘটাতে পারে। সত্যকে সে বিকৃত করে না কখনও, কিন্তু ওই সত্যকে রেখায় রেখায় ঠিক রেখেও রূপে লাবণ্যে সুন্দর করে তুলতে পারে। মানুষেরও মোহ আছে। তারা কাগজে ছাপার জন্যে ছবি দেবার সময় বেছে বেছে লাবণ্যময় ছবিগুলিই দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকবে।

আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বললাম—আসুন, ভিতরে আসুন।

মেয়েটি শ্লীপার খুলে আমার দিকে তাকাতে তাকাতেই ঘরের ভিতরে এসে সামনের ফরাসে বসল। তার পিছন পিছন ভদ্রলোক দুটি।

প্রবীণ ব্যক্তিটিই পরিচয় করে নিলেন,বললেন—নমস্কার। আমার নাম—মহিমচন্দ্র বোস। ফিল্ম ডিরেক্টারী করি। আমার ছবি……

আমি প্রতিনমস্কার আগেই করেছিলাম—বললাম—হ্যাঁ, কয়েকখানা ছবি আপনার দেখেছি।

—হ্যাঁ। আগে ছবি সেন্সরের সময় একবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—ইনি হলেন—ফিল্মস্টার সুরূপা ব্যানার্জী, উনিই ছবি করবেন।

মেয়েটি তখন মুখ নিচু করে বসে জাজিম চাদরের সুতো ছকে ছকে তর্জনী বুলিয়ে যাচ্ছিল। লক্ষণটা নার্ভাসনেসের। যেন আমার দিকে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করছিল। সে এবার মুখ তুলে তাকালে —একটু হাসলে। কিন্তু যেটা করা উচিত সেটা করলে না—অর্থাৎ নমস্কারটা করলে না। আমিই নমস্কারটা করলাম, বললাম—নমস্কার।

মেয়েটির মুখ কেমন হয়ে গেল। সে চঞ্চল হয়ে উঠল। চঞ্চলতার মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি আপনাকে প্রণাম করব।

বয়স হয়েছে, প্রণাম নেওয়া বয়সের একটা ধর্ম। সম্ভবতঃ ওটা কালের অধিকার। তার উপর কালের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা যোগ হলে, ও-অভ্যাসটা খানিকটা কায়েমী স্বার্থভোগীদের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। আমি বললাম কেন—প্রণাম কেন?

কিন্তু মেয়েটি এসে আমার ডেস্কের পাশে দাঁড়াল। হাতখানি উদ্যত হল দেহখানি নত হল। আমিও পা না বাড়িয়ে পারলাম না।

সে প্রণাম করে যেন খানিকটা সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে সামনে গিয়ে বসল। তারপর বললে—কতদিন থেকে যে আপনাকে দেখতে —প্রণাম করতে আমার ইচ্ছে। কিন্তু আসতে পারি নি! কেমন ভয় হয়েছে, লজ্জা হয়েছে।

আমি বললাম, ভয়ের বা লজ্জার তো কিছু নেই। অন্য দাবী নেই আমার, বয়সের দাবীই আমার দাবী। তুমি বয়সে ছোট, সেই দাবীতে এলেই পারতে।

—আমি আপনাকে কিন্তু দাদা বলবো।

মনটা খুব প্রসন্ন হল না। কারণ প্রথমেই যেন একটু বেশী এগিয়ে অন্তরঙ্গ হতে চাচ্ছে বলে মনে হল। বোধ হয় সেটা ভ্রূভঙ্গীতে এবং মুখভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। সে বলেছিল, রাগ করবেন না তো!

—না না। রাগ করব কেন। আমার ছোট মেয়ে তোমার থেকে অনেক বড়। আমার বড় নাতনী খুকু তার বয়স আঠারো হল।

সুতরাং দাদা থেকে দাদু পর্যন্ত যা বলবে তাতে আপত্তির অধিকারই নেই আমার।

পরিবেশটা সহজ হয়ে উঠেছিল এবার।

সে বলেছিল—আমি মনে মনে অনেকদিন থেকেই আপনাকে দাদা বলি।

—বেশ তাই বলো। কথা বলতে বলতে কখন যে তাকে তুমি বলতে সুরু করেছি সে খেয়াল আমার ছিল না। খেয়াল যখন হল তখন আপনি আজ্ঞে ফিরিয়ে এনে দুজনের ব্যবধানটা বাড়িয়ে দুস্তর করে রাখবার উপায় ছিল না আর।

মহিমবাবুর হাতে সিগারেটের টিন ছিল সেটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন আর ইনি হলেন সুধীর ঘোষ। ইনিও রাইজিং স্টার।

সুধীর নমস্কার করলে। আমিও প্রতিনমস্কার করলাম।

মহিমবাবু বললেন, আপনার সময়ের অনেক দাম। বেশী নেব না। এখন আসল কথা বলি। সুরূপা দেবী একখানা ছবি করতে চান। ওঁর ঝোঁক আপনার গল্প নেবেন। আমারও অনেক দিন থেকে ইচ্ছে আপনার গল্প নিয়ে ছবি করি।

আমি বললাম—কোন্ গল্প বলুন?

সুধীর এবার বলল—মানে, গল্প একটা লিখে দিতে হবে।

লিখে দিতে হবে?

হ্যাঁ। সুরূপা দেবী আইডিয়াটা বলবেন। কথাটা মহিমবাবু বললেন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম সে তো আমি কখনও করিনে।

সুরূপা ওই গদীর উপরেই দুখানা হাত বাড়িয়ে বললে—এটা আপনাকে আমার জন্যে করতেই হবে।

—মাপ কর। তা আমি করিনে—করব না।

কণ্ঠস্বর আমার একটু বেশী কঠিন হয়েই বোধ হয় উঠেছিল। এবং

সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গিতেও প্রকট হয়েছিল—মাথা নেড়েও অস্বীকার করেছিলাম। যার ফলে অস্বীকৃতিটুকু একটা আঘাতের মত হয়ে উঠেছিল, যার ফলে ওরা সকলেই নির্বাক হওয়ার মত চুপ করে গিয়েছিল।

সুধীর এবং মহিম এ-ওর কানের কাছে ফিসফিস করে কথা বলেছিল কিছুক্ষণ। সুরূপা জাজিমের ছকের উপর দৃষ্টি রেখে বসেছিল।

সুধীর এবং মহিমের পরস্পরের মধ্যে কথা শেষ হ'লে মহিম বলেছিল, আমরা কোন হিরোইন-প্রধান বই খুঁজছি। সে রকম বই আপনার—

—আছে। পড়ে দেখতে পারেন।

—আপনি একখানা পছন্দ ক'রে দিন।

আমি দু-তিন খানা বইয়ের নাম করলাম। সুরূপা অকস্মাৎ মাথা তুলে বলে উঠল—না। উঠুন। আচ্ছা আসি।

বলে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—প্রণাম করব।

—আবার কেন?

—এইটেই তো নিয়ম! আর আমারও ইচ্ছে বটে। নইলে মনে হবে আপনিও রাগ ক'রে রইলেন। আমিও রাগ ক'রে চলে গেলাম।

—বেশ প্রণাম কর।

প্রণাম ক'রে চলে গিয়েছিল। জানালা দিয়ে দেখছিলাম সুরূপা নিজেই মোটরখানা ড্রাইভ ক'রে চলে গেল।

এইখানেই শেষ নয়। আরও দিন দুয়েক সে এসেছিল। টেলিফোনও করেছিল।

কথা সেই এক কথা। গল্পটা লিখে দিতে হবে।

আমি "না" বলে থাকি, এমন ক্ষেত্রে ধরেও থাকি, ধরেই ছিলাম। "না"-ই বলেছিলাম।

টেলিফোনে শেষ পর্যন্ত বলেছিল আপনি অন্ততঃ শুনুন!

—না।

—কেন ? একটা কাহিনী শুনে লিখবেন—। লেখেন না ?

—লিখি। শোনা কাহিনী নিয়ে নিশ্চয় লিখেছি। কিন্তু ছবির জন্যে লিখি না—লিখব না।

—শুনবেনও না ?

—না !

—আপনি যা—। থেমে গেল সে।

—কি ? যা চাই তা দেবে ? অর্থ তোমার হয়েছে—থাক। আমি চাইনে। তুমি আর টেলিফোন করো না।

আর টেলিফোন সে করেনি। দেখাও করেনি। আমিও সুরূপার কথা মনে রাখিনি। সুরূপা ছবির ক্ষেত্রে এমন কিছু করতেও পারেনি—যাতে সে তার কথা আমাকে মনে করাতে পারে। তবে মধ্যে মধ্যে কাগজে সিনেমা পত্রিকায় সাপ্তাহিকে সুরূপার ছবি দেখেছি। অনেক ছবি বেরিয়েছে। তা থেকে তার সঙ্গে সেদিনের কথাগুলি কোনক্রমেই জেগে উঠেনি। মনেও হয়নি যে সেদিন তার অনুরোধটা রাখলেই হত।

আজ দু-আড়াই বছর পরে টেলিফোন পেয়ে একটু চঞ্চলই হলাম। এই দু-আড়াই বছরের মধ্যে মেয়েটি নিশ্চয় খুব জোর দৌড়েছে জীবনে। জুয়ো খেলতে যে সব ঘোড়া রেসে দৌড়োয় তাদের মত। অনেক যত্ন অনেক পরিচর্যা অনেক খরচ করেও এই ভাগ্যবান ভাগ্যবতী অশ্ব ও অশ্বিনীকুল যেমন রেসে নেমে....মুখ থুবড়ে পড়ে মরে—তেমনি ভাবেই দৌড়ুতে গিয়ে সুরূপা বোধ হয় মুখ থুবড়ে পড়েছে। টি-বি হয়েছে। হাসপাতালে মরেছে। সুরূপাও ওই রেসের ঘোড়া টি-বি অনাহারের রোগ, অনাচারের রোগ। অনাহার সুরূপার নিশ্চয় ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্য ! আমাকে স্মরণ করেছে শেষ সময়ে।

কেন ?

মেয়েটিকে মনে পড়ছে। রূপশাস্ত্রের যে ব্যাকরণ সে অনুযায়ী

মেয়েটি সুন্দরী নয় ; কিন্তু একটি শীর্ণ ক্লান্ত লাবণ্য আছে। রঙটি উজ্জ্বল মাজা। মাঝারি মাথায়, মেয়েটির লাবণ্যের সব দিক থেকে বেশী মাধুর্য তার সর্বাঙ্গব্যাপী একটি বিষণ্ণ ক্লান্তিতে।

চোখ দুটি আশ্চর্য স্বচ্ছ।

টি-বি হয়েছে। তবে কী বীজ তখনই তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল ? করে থাকলেও তা মনে হয়নি। কোন সন্দেহ হয়নি।

গত দু-বছরের মধ্যে খবর আমি না রাখলেও কিছু কিছু খবর আপনি আপনি কানে এসে পৌঁছেছে। ওই রেসে দৌড়ুনোর মত দৌড়ুনোর খবর। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় সে আমাকে স্মরণ করলে কেন ? বিস্ময়বোধ করছি। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই বিষণ্ণ ক্লান্তিটুকু স্মরণ করে বেদনাও অনুভব করছি।

॥ দুই ॥

সেই স্বরূপা মৃত্যুশয্যায় টি-বি হসপিটালে আমাকে স্মরণ করেছে। কেন? আমাকে সে স্মরণ করবে কেন? জীবনে একবার মাত্র পরিচয়। তাকে পরিচয়ই বা বলব কি করে? আমার কাছে নিছক বেচাকেনার কারবারে ক্রেতার মত এসেছিল। সে কারবারে তার সঙ্গে আমার বনেনি, ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তা নিয়ে কি কিছু বলবার আছে তার? কি বলবে? ডাক্তার বললে—স্বরূপা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য খুব ব্যগ্র।

কেন?

প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই আমার মনকে আলোড়িত করছিল। জীবনে অনেক মানুষ, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে, লেখকদের আপনার জন ভাবেন। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা জেনেছি। অন্য লেখকদের কাছ থেকেও শুনেছি। গুণমুগ্ধেরা সই চান—ছবি চান- পত্র লিখে উত্তর চান, দূর থেকে আলাপ করতে চান, কাছে আসতেও চান; অনেকের কাছে শুনেছি— অনেক লেখকের জীবনী পড়ে পেয়েছি যে এর মধ্যে থেকে প্রেমও হয়েছে। অনেক মেয়ে আজীবন ভালবেসে গেছে। আমার জীবনে আমি এ বিষয়ে একটু সতর্ক। আজ বার্ধক্যের কোঠায় পা দিয়েছি কিন্তু একদিন প্রেমের বয়স ছিল। সে বয়সেও আমার সতর্কতা ছিল। তার কারণ আমার নিজের ছিল পরিপূর্ণ সংসার। বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে, তখন স্ত্রীর বয়স ছিল দশ। যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আমার প্রতিষ্ঠা হয় তখন আমার বয়স বিয়াল্লিশ, স্ত্রীর বয়স ছত্রিশ। বড় ছেলে এম-এ পড়ত, কুড়ি বছর পার হয়েছে। ছোট বা মেজ আই-এস-সি পাশ করেছে। বড় মেয়ের বিবাহ দিয়েছি.

পনের বছরে ; বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রূপবান জামাই। ছোট মেয়ে বছর দশেকের। নিজের মনকে নিজেকে শাসন করতে হত না ; চারিদিকে পরিবারের স্নেহের জনতা সতর্ক প্রহরীর মত প্রহরা দিত। তাছাড়া আর এক শাসনকর্তা আমার ছিলেন, অভিভাবক ছিলেন—আমার ঈশ্বর, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মা আমার দিকে ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন।

এ সত্ত্বেও মনের মধ্যে স্নেহেরই হোক বা প্রেমেরই হোক ক্ষুধা একটা ছিল। আজ সে ক্ষুধা নেই কিন্তু একদিন ছিল-নিশ্চয় ছিল ; তাই কোন মুগ্ধ পাঠিকা নিয়মিত পত্রালাপ সুরু করলে দু-চার খানা সতর্ক গাম্ভীর্যপূর্ণ পত্রে সাহিত্য জীবন ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নোত্তরের পর যে মুহূর্তে ব্যক্তি জীবনের দরজায় সে করাঘাত কবত—এবং আমি দরজা খুলতাম—সেই মুহূর্তেই তাকে মা বোন বলে সম্বোধন করে একটা এমন সম্পর্ক পাতিয়ে নিতাম যেটায় স্নেহ শ্রদ্ধায় শোধন করা দেহ-সম্পর্কহীন ভালবাসার আদান-প্রদানে কোন বাধা নেই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বোন সম্পর্কটাও আজ উঠিয়ে দিয়েছি। পুরানো কালের দু-চারজন বোন আছেন। কখনও কখনও হয়তো তাদের দিক থেকেই তাঁরা স্মরণ করেন ভাই-ফোঁটায় ফোঁটা দিয়ে যান। এখন সেকালও বিগত। এখন মেয়েরা শুধু মা আর কন্যা।

শোভাবাজারে আমার মা আছে অপর্ণা। বরানগরে মেয়ে আছে বুলু। তবুও সে যৌবনকালে সম্পর্ক না-পাতানো দু-একজনকে পত্র লেখবার সময় এক-আধবার অসতর্ক মুহূর্তে গাঢ় কথা দু-চারটে লিখেছি কিনা হলপ করে বলতে পারব না। কিন্তু সুরূপার সঙ্গে কোন পত্রালাপই করিনি। যদি করতামও তা'হলে এমন কথা লিখেছে কিনা সন্দেহ করতাম না। কারণ তার সঙ্গে আমার দেখা যখন হয়েছে তখন আমার বয়স বাষট্টি পার হয়ে গেছে।

ঠিক বুঝতে পারলাম না সুরূপা কি সূত্র ধরে বা কি কারণে আমার সঙ্গে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেখা করতে চেয়েছে। মনে নানা কল্পনা

একটার পর একটা এল গেল, কিন্তু কোনটাই ঠিক বলে মনে হল না। শুধু একটা কথা মনে কিছুটা সম্ভবপর বলে মনে হল।

হয়তো, মৃত্যুর আগে সে তার জীবনের কথা বলে যাবে। এ আকাংখা অনেকের মনে আছে ও থাকে। জীবনের দুঃখ বেদনা জানিয়ে যেতে চায়। জীবনে যতকাল বাঁচল ততকাল যারা ভালবাসা পেলে না—স্নেহ পেলে না—সহানুভূতি পেলে না—তাদের অনেকেই চায় নিজের কথা বলে যেতে—উদ্দেশ্য সেটা লেখকের কলমে প্রকাশিত হবে এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজ দেশ এবং মানুষকে তিরস্কার করে যাবে। এবং লোকসমাজ দেশ তার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বলবে অন্যায় করেছি ; পরলোক মানুক বা না-মানুক, এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তার মনে এই কথাই থাকে যে মৃত্যুর পরও তার এতে পরিতৃপ্তি হবে।

অনেক জনের এমন চিঠি আমার কাছে আছে। এইভাবে দেখা করে মানুষ বড় একটা নিজের কথা বলে যায় না—অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিঠি লিখেই জানায়। তার মধ্যে পত্র-লেখকের ওই মনটাই অর্থাৎ মনের ওই আকাঙ্ক্ষাটাই বড় হয়ে ওঠে। সেপৃথিবীকে ভালবেসেছে, মানুষকে ভালবেসেছে, দেশকে ভালবেসেছে, বিনিময়ে অল্প কিছুটা ভালবাসা স্নেহ সহানুভূতি চেয়েছে, কিন্তু নিষ্ঠুর পৃথিবী নিষ্ঠুর মানুষ তাও তাকে দেয়নি। জীবনে সে পেয়ে গেল শুধু অবজ্ঞা অবহেলা উপেক্ষা।

অনেকে লেখে এ কথাও যে তবু সে এই শেষকালেও পৃথিবীকে হৃদয় উজাড় করে ভালবাসা দিয়ে যাচ্ছে। চিঠিগুলি সুদীর্ঘ হয় ; জীবনের কাহিনী সবই লেখা থাকে। তবুও এসব নিয়ে লিখতে পারিনি, লেখা যায় না বলেই ধারণা হয়েছে আমার। কারণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই জীবনের সব ভালবাসাটা সে নিজের উপর ঢেলে লিখেছে। পৃথিবীকে মানুষকে ভালবাসার কোন প্রমাণ কোন চিহ্ন বা অভিব্যক্তি তার মধ্যে পাইনি। মনে হয়েছে অনেক কথা ঘুরিয়ে লিখেছে, অনেক কথা লেখেনি গোপন করে গেছে।

দু-একজনের অকপট অভিব্যক্তি পেয়েছি। কিন্তু তাও অসমাপ্ত।

যে জীবন বাস্তব যার প্রতি ঘটনাটি অকপট সত্য তার সমাপ্তি কল্পনা করতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছি। ভয় হয়েছে। হয়তো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলব? কারণ এ যুগে জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে—সে ধারণা বাস্তবে কতটা সত্য তা জানি না,তবে নানান দেশের লেখা পড়ে,নানান মতবাদের প্রভাবে ধারণাটা মনে মনে সত্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে লেখক-মনে। মহাযুদ্ধের কাল থেকে সে ধারণা বা থিসিস অনুযায়ী—মানুষের সততা নাই,মানুষ সৎ নয়—জীবন জীবদেহাশ্রয়ী দেহবাদ এবং লোভ এই দুটোই শ্রেষ্ঠ এবং আসল নিয়ামক। সতী বল লক্ষ্মী বল ধার্মিক বল কর্মী বল—সব মানুষই অর্থমূল্যে অর্থাৎ লোভে অভাবে ক্ষোভে আত্মবিক্রয় ক'রে অবলীলাক্রমে। অথচ আমার ঘরে আমার স্ত্রী রয়েছেন,কন্যা রয়েছেন, পুত্রবধূ রয়েছেন, ছেলেরা রয়েছেন। তাঁদের অহরহ দেখছি। শুধু আমিই বা কেন অন্য যাঁরা লেখেন, যাঁরা এতেই বিশ্বাস করেন - দেখছি তাঁরাও তো সুখে ঘর করছেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে; অগাধ বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত সুখ-নিদ্রায় রাত্রিযাপন করেন, পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাঁদের রান্না করা আহার্যে দিন দিন পরিপুষ্টিতে শ্রীমান হন; উল্লাসে হাসেন, নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কেউ নিন্দা করলে, সে নিন্দাকে অসত্য মিথ্যা বলেই তাতে ক্ষুব্ধ হন, রুষ্ট হন।

আমাদের গ্রামের গায়ত্রীকে চোখে দেখেছি আজীবন। দরিদ্রের কন্যা কালো রঙ হলেও কুশ্রী নয়। বাপ মারা গেল। মেয়ে বিবাহ-যোগ্যা। মা বহু কষ্টেই বিবাহ দিলেন। কিন্তু পাত্র চরিত্রহীন। সে তাকে নিলে না। গায়ত্রী চোদ্দ বছর বয়স থেকেই গ্রামে পাড়ায় এর বাড়িতে ঠাকুরের ভোগ রান্না ক'রে, এর ওর বাড়িতে জলতুলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মা ভাইদের মুখে আহার যুগিয়ে এল। ভাইকে গ্রামের ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করালে। কিন্তু গায়ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে অতি সন্দেহবাদীও কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, একটি ক্ষেত্রে গায়ত্রীর নিন্দা করতে পারে আধুনিক যুগের মানুষ। গায়ত্রীর

মাথা নত হয়ে আছে ভগবানের চরণধূলার তলে নয়—মানুষের পায়ের দিকে। সে বিনত! নম্রতার মধ্যে দীনতার দৈন্য আছে। তার হাত শুধু আশীর্বাদের জন্যই অঞ্জলিবদ্ধ হয় না—বস্তুর জন্যেই অঞ্জলি পাতে সে। অভাবের তাড়নায় কাঙালপনাটা তাকে আশ্রয় করেছে। তবে সে ভিক্ষাই চায়; কখনও নিজেকে বিক্রি করে উপার্জন করে না। যে সমাজের বিধিব্যবস্থায় মানুষকে এমন কাঙাল ক'রে সে সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যাক। গুঁড়ো হয়ে ধুলো হোক। সে গুঁড়ো করবে এই মানুষেরাই। সুতরাং সব মানুষ লোভে ক্ষোভে অর্থ মূল্যে বিক্রি হয়ে গেল—এ কথা সত্য বললে তার থেকে বড় মিথ্যা আর হতে পারে না! গায়ত্রী মাত্র একটা নয়। গায়ত্রী অনেক আছে। এই ধারণা বা থিসিস্ সত্য বলব কি করে! বরং আশঙ্কা হয়—হয় তো বা এই থিসিসটাকে আগামী কালে সত্য করে তুলব আমরাই।

তাই এমন কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে যা অসমাপ্ত তাকে সমাপ্ত করতে চাইনে।

সুরূপার জীবনে সে যেখানে এসে পড়েছে এবং তার সম্পর্কে নানানজনের মুখে এই জগতের সংবাদ পরিবেশকদের মাদকতাশ্রিত সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে যে তথ্য পেয়েছি তাতে তার জীবনে উত্তেজনাত্মক বিস্ময়কর অনেক কিছু আছে। কিন্তু যারা দারিদ্র্যের মধ্যে, অভাবের মধ্যে প্রাণপণে লড়াই করে যায় তাদের সঙ্গে কোন মিল নেই। বড় জোর পাব ছুটোর একটা। নিষ্ঠুর ক্ষোভে সে অধঃপতিত স্বামীর কাছ থেকে বিদ্রোহ করে এসে এই পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে; যার ফলে অভিনয় শুধু সে পর্দার বুকেই করে গেল না। নিজের জীবনটাকেও অভিনয় করে ফেললে। অথবা কাউকে ভালবেসে তারই প্ররোচনায় এসে এই ভাবে সব দিয়ে বাইরের জীবনটাকে মিথ্যা করে ভিতরে জীবনে বিচিত্রভাবে সত্যকে পেয়ে গেল।

ভাবতে ভাবতেই গিয়ে পৌঁছুলাম হাসপাতালে। ডাক্তার সেন—বয়সে সবে যৌবন পার হয়েছেন · বিদেশী ডিক্রিধারী বিচক্ষণ

চিকিৎসক এবং অমায়িক ভদ্রলোক। তিনি আমার জন্যেই প্রতিক্ষা করছিলেন। নইলে এটা তাঁর বিশ্রামের সময়। তাঁর নিজের ঘরে বসিয়ে হেসে বললেন– আপনার কষ্ট হল—এই দুপুরে আসতে কিন্তু আমার লাভ হয়েছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলাম। সৌভাগ্য তো বটেই। অন্যসময়ে এলে আবাবনিজের সময় মিলত না।

এ সব কথা সচরাচর অত্যন্ত ফর্মাল হয়ে থাকে। কিন্তু ডাঃ সেনেব কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার সুস্পষ্ট আভাস ছিল। আমি বিব্রত হলাম বললাম—এ ভাবে বললে লজ্জা পেতে হয়? আলাপ করার সৌভাগ্য বলতে গেলে তো আমারও। আপনাব নাম আপনার খ্যাতি তো কম নয়!

তাব উত্তরে তিনি নিজেকে আরও বিনীত করতে চাইলেন, কিন্তু সে কথা থাক; এ পর্বটা শেষ করেই তাঁকে বললাম—সুরূপা মেয়েটি কি সত্যিই বাঁচবে না? এমন অবস্থা খাবাপ হয়ে গেল—অথচ ওর তো অবস্থা খারাপ নয়—সময়ে চিকিৎসা করাতে পারত। এবং করালে তো একালে রোগটা সে কালের মত দুঃসাধ্য দুরারোগ্য নয়—ভাল হয়ে যেত। তা করায়নি কেন?

ডাক্তার বললেন—ওঁর একটা অপারেশন হয়েছে। সেটা যেন ঠিক স্ট্যাণ্ড করতে পারছেন না। সেটা স্ট্যাণ্ড করতে পারলে বেঁচে যাওয়ার কথা। সকালের দিকে যখন আপনাকে ফোন করি—তখন পর্যন্ত অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। সবথেকে বড় কথা ছিল রেস্টলেস্‌নেস। জানেন কিনা জানি না অপারেশনের পর—একটা সময় পর্যন্ত পেশেণ্ট অজ্ঞান হয়ে থাকে—জ্ঞান হবার উপক্রম হলে আমরা ইনজেকসন দিয়ে গাঢ় ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। হাত পা বাঁধা থাকে। ওঁর সে সময়ের পরও ব্লিডিং হয়েছে; এবং রেস্টলেস্‌নেস। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো বাঁচাতে পারব না। তারই মধ্যে বারবার আপনার নাম করেছিলেন। এবং—। একটু হাসলেন ডাক্তার।

হেসে বললেন—খ্যাতি আছে সমাদর আছে মানুষের কাছে—এ

সব ক্ষেত্রে মরব মরব একটা বাতিকও থাকে। সেটা মরবার ভয় খানিকটা বটে। কিন্তু তার থেকেও লোকের কাছে সমাদর সহানুভূতির আবদারও বটে। সেইটেই বেশী।

কথাটা হয়তো অনেকটা সত্য। কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। সুরূপা ফিল্ম এ্যাক্ট্রেস, তার পক্ষে এটা হয়তো সত্য হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মৃত্যুতত্ত্ব সন্ধানী অনেকে আছেন তাদের পক্ষে কথাটা সত্য নয়। সে কথা থাক। তর্ক ডাক্তার সেনের সঙ্গে করলাম না, বললাম—ওকে তা হলে একটা খবর দিন, যদি জেগে থাকে—

—খবর দেওয়া আছে। ঘুমুচ্ছে এখন। জাগলেই নার্স আমাকে খবর দেবে। একটু বসতে হবে আপনাকে।

—বসতে হবে? কতক্ষণ বলতে পারেন?

—তা একঘণ্টা হতে পারে। তার বেশী হবে না।

—তাহলে ওআরও একটুসুস্থ হোক না। তারপর একদিন আসব

—না তাহলে হয়তো উত্তেজিত হবেন। চেঁচামেচি করবেন। বলবেন আমাকে জাগালেন না কেন? জানেন তো এরা এমন আবদেরে হয়! অনিষ্ট হত বললে মানবে না, বলবে হোতো তো হোতো। আমার হোতো। অন্য পেশেণ্টকে ধমক দিয়ে রাখা যায়, এদের যায় না। লীডার-টিডার বা আপনাদেব মত যাঁরা হন তাঁরা গার্জেনের মত আমাদেরই হুকুম করেন, মানে দৃপ্তভঙ্গিতে আইন অমান্য করেন—আর এঁরা আদুরে ছেলের মত আবদার ধরে আইন ভাঙেন—আমাদের চুপ করতে হয়।

কথাগুলো একান্তভাবে সময়ক্ষেপের জন্যই ডাক্তার সেন বলে যাচ্ছিলেন তা যে-কেউ হোক বুঝতে পারত। এবং তিনি তা গোপন করতেও চাননি। চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। এসেছি যখন তখন সত্যিই কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে অধীরতা প্রকাশ করে চলে যাওয়ার অর্থ হয় না। আমার আপনার জন হলে পারতাম না।

বাইরের বাড়ি-ঘরগুলি দেখছিলাম। আগেও একবার এখানে এসেছি। পরাধীনতার সময় অনেক দৈন্য এবং অভাবের মধ্যে জনসাধারণের বদান্যতায় এবং কয়েকজন অক্লান্ত কর্মী মহাপ্রাণ চিকিৎসকের চেষ্টায় ও প্রাণপাত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছিল হাসপাতালটি। বাংলাদেশে তখন একমাত্র এই একটি টিবি হাসপাতাল ছিল। ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। তারপর এখন এই স্বাধীন দেশে এর অনেক উন্নতি হয়েছে। নানান দাতার নামাঙ্কিত ওয়ার্ডগুলির নাম পড়ছিলাম। ওদিকে কটেজগুলি দেখা যাচ্ছে।

আমাকে বাইরের বাড়ি-ঘরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ডাক্তার বললেন—চলুন না দেখে আসবেন একটু ঘুরে। আগে একবার দু-বার এসেছিলেন সেটা শুনেছি। কিছু আপনার দেওয়া বইও দেখেছি লাইব্রেরীতে। একবার কখন বিজয়া সম্মেলনীতেও এসেছিলেন, মুখে মুখে কথাটা এখনও বেঁচে আছে। তখন কি দেখেছিলেন সব ঘুরে?

—দেখেছিলাম। তখন অবশ্য অনেক ছোট ছিল।

—তাহলে চলুন। একবার ঘুরে দেখুন।

—চলুন।

বেরিয়ে পুরনো সাবেক আমলের ওয়ার্ডটিতে নিয়ে গেলেন ডাক্তার সেন। মনে পড়ে গেল এই ওয়ার্ডে একটি রোগীর কথা। বড় কষ্ট হয়েছিল দেখে। বুকের পাঁজরা কেটে অপারেশন হয়েছিল তার। হাত পা খাটের সঙ্গে বাঁধা ছিল। হাতে রবারের টিউব শিরায় ঢুকিয়ে রক্ত দেওয়া হচ্ছিল। অজ্ঞান রোগীটির মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙ্গছিল। তার সঙ্গে একটা যন্ত্রণা-কাতর গোঙানি। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। ডাক্তারবাবু যিনি সেদিন সঙ্গে ছিলেন তাঁকে বলেছিলাম—চলুন—ডাক্তারবাবু। চলুন।

চলে শুধু ওই ঘর থেকেই যাইনি—আর কোন ঘর দেখিনি, দেখতেও চাইনি।

—স্যার!

কে পিছন থেকে স্যার বলে ডাকল। ডাক্তার সেন পেছন ফিরে তাকিয়ে একজন হসপিটাল স্টাফকে দেখে বললেন—কি ?

ঘুম ভেঙেছে। নার্স খবর দিতে বললেন।

—ও! আচ্ছা বলগে—আমরা আসছি। ওঁকে একটু দেখাচ্ছি সব। হয়ে গেলেই যাচ্ছি।

—খুব ব্যস্ত হয়েছেন স্যার। নার্স বললেন—এক্ষুনি আসতে।

—এখুনি আসতে হবে—

আমি বললাম—তাই চলুন।

কটেজের মধ্যে বিছানায় শুয়েছিল সুরূপা। তার বিছানার পাশে রক্ত দেওয়ার যন্ত্রটা এখনও খাড়া হয়েই রয়েছে। ঘণ্টা কয়েক আগে পর্যন্ত রক্ত দিতে হয়েছে। তার ছিল মাজা রঙ—সে রঙ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলগুলি বাতাসে উড়ছে। শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে। ঠোঁট দুখানি শুকনো নীরস এবং তামাটে রঙের হয়ে গেছে। চোখ দুটিতে ঘোর রয়েছে। পাতা যেন থাকতে থাকতে নেমে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু চোখের সাদা অংশটা আশ্চর্য দীপ্ত এবং কালো তারা দুটি যেন তরল হয়ে টলটল করছে মনে হচ্ছিল। ঘরের দরজার দিকেই সে তাকিয়েছিল আমার প্রত্যাশায়। আমি ঢুকতেই চোখের পাতা দুটি ক্ষণেকের জন্য ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল মনে হল। চোখ দুটি জ্বলে উঠল প্রদীপের বাড়িয়ে দেওয়া শিখার মত। মধ্যে মধ্যে ইলেকট্রিক লাইনে হঠাৎ ভোল্টেজ বেড়ে গেলে বাল্বের আলো যেমন উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে তেমনিভাবেই দীপ্ততর হয়ে উঠল মনে হল।

সামনে একখানা চেয়ার রাখা ছিল আমি সেইটেতে গিয়ে বসলাম। দেখলাম, সুরূপা স্তব্ধ হয়েই আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

—আমি বললাম—আমাকে—

সে মৃদু স্বরে বললে—হ্যাঁ ডেকেছি। দেখতে চেয়েছি।

উত্তরে কি বলব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কেন? এ প্রশ্ন করতে বাধছিল। মনে হচ্ছিল প্রশ্নটা রূঢ় হবে। অবশেষে একটা কথা খুঁজে পেলাম।—বল। তারপরই বললাম— বয়সে তুমি আমার ছোট মেয়ের চেয়েও ছোট। তুমি বললাম। কিছু মনে করো না।

একটু হেসে উঠল তার মুখ। সেই হাসিমাখা মুখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কি যেন একটা রহস্যের কুয়াসা ওই দৃষ্টির আলোয় আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠতে সুরু হল। আমি এর অর্থ যেন শীতেব ভোরে কুয়াসার মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। শীতের সকালে কুয়াসা জাগে—ধীরে ধীরে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে যেমন চোখের সামনে যা-কিছু দৃশ্যমান সব ঢেকে ফেলে—তেমনিভাবে আমার মনের সব অনুমান ঢাকা পড়ে গেল। এমনকি ওই মেয়েটিও যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল।

একটু অসহিষ্ণু হয়েই বললাম—কি বলছ বল?

সে বললে—আমার গল্পটা দিলেন না তো?

খুব মিষ্ট করে বললাম—সংসারে পরের গল্প কি পরে লিখতে পারে? শুনে কি জানা হয়? না—সে জেনে কি লেখা হয়?

—কল্পনা করে তো লেখেন।

—লিখি। কিন্তু সে কল্পনা নিজের। কল্পনা তখন বাস্তব থেকেও সত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পরের কল্পনা—নিজের করা যায় না।

—আমি মরে গেলে আমার জীবন নিয়ে গল্প বা উপন্যাস লিখবেন—বলুন।

সহজে হ্যাঁ বলতে পারলাম না। আজ কাল অনেক সিনেমা স্টার নিজের জীবনকথা লিখছেন। তার মধ্যে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি—তাতে কতকগুলো ঘটনাই পাই, জীবন পাইনে এবং তার মধ্যে দিনের আলোর উত্তাপও পাইনে—রাত্রির অন্ধকারের বেদনার্ত হিমস্পর্শও পাইনে। আকাশে নক্ষত্রের ঝিকিমিকিও থাকে না—গাছেব তলায় ছায়ার মধ্যে চিরন্তনকালের আভাসও নেই। থাকে

স্টুডিয়োর বা সাজানো ঘরের মধ্যে ঝকমকে ফ্লাস লাইটের আলো অথবা রাত্রিকালে নীলাভ আলোর কৃত্রিম অন্ধকার। এ নিয়ে লেখবার প্রতিশ্রুতি দিতে মন সায় দিচ্ছিল না। অথচ একটি মরণ-পথযাত্রিণীর শেষ অনুরোধ তাই বা উপেক্ষা করি কি করে!

আমার দৃষ্টি চিন্তার মধ্যে বাস্তবকে হারিয়ে ফেলেছিল। সুরূপার মুখও আমি দেখছিলাম না।

হঠাৎ সুরূপা বললে—সুতপা বলে একটি ছোট মেয়ে—ভাল অভিনয় করত, খুব প্রগলভা ছিল। নাচত, গান করত ভাল, তাকে মনে পড়ে? দশ বছরের সুতপা—পাটনা—

চমকে উঠলাম।

॥ তিন ॥

সুতপা? পাটনা? পাটনার সুতপা দশ বছরের ফুটফুটে মেয়েটি। সাজগোজে প্রসাধনে সেই দশ বছর বয়সেই সে হয়ে উঠেছিল পটিয়সী। নাচে গানে তখনই সে বাঙালী সমাজে খ্যাতিমতী। আমিই তাকে একদিন বলেছিলাম, তোমার নাম সুতপা না হয়ে সুরূপা হওয়া উচিত ছিল। সেই নামেই সে নিজেকে পরিচিত করেছে পরবর্তী জীবনে! আশ্চর্য, কথাটা আমার মনেই হয়নি। আমি ওকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

ভুলে যাবারও কোন দোষ নেই—আক্ষেপও নেই সে জন্য। পনের বছর আগে দেখা দশ বছরের মেয়ে—তাকে মনে থাকার কথা নয়। জীবনে রূপ দিয়ে লাস্য দিয়ে হাস্য-কটাক্ষ দিয়ে পুরুষের মনে রেখাপাত করবার কোন শক্তিই থাকে না—দশ বছরের মেয়ের। ওখানে নারীর আসল মূলধন পূর্ণ নারীত্ব;—যৌবন—, অন্তত কৈশোর অতিক্রম করবার অবস্থা না এলেও মূলধনের উপর অধিকার বর্তায় না।

এতকাল পরে—মনে পড়ানোয় মনে পড়ছে। পাটনায় সরকারী চাকরে ছিলেন—সুতপার বাবা সৌরীন চক্রবর্তী। আপার গ্রেডের ক্লার্ক হয়ে বেহার সেক্রেটারিয়েটে ঢুকেছিলেন। ওখানে কয়েক পুরুষ ধরেই প্রবাসী। ছাত্র হিসেবে খ্যাতি ছিল; তরুণ হিসেবে অতি আধুনিক বলত লোকে; প্রবাসী বাঙালীদের জীবন ধারায় ইংরিজীর প্রতি অনুরাগের স্রোতটা চিরদিনই খরস্রোতা; সেটা নিশ্চয়ই চাকরির জন্য। সেজন্য দোষ তাঁদের নেই। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববন্দিত হওয়ার পর থেকে তরুণ সমাজ বাংলা সাহিত্যের উপর ঝুঁকেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও আধুনিকতমদের ইংরিজী ও কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের আদর্শ অনুকরণের ঝোঁকটা ছিল প্রবলতর। সৌরীন চক্রবর্তী বি-এ পড়তে

পড়তে আধুনিকতম ইংরিজী সাহিত্যের বড় পড়ুয়া বলে ছাত্র সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই নাক হয়ে গিয়েছিল উঁচু বা ওল্টানো। লোকে ব্যঙ্গ করত—কিন্তু মনে মনে একটু সপ্রশংস বিস্ময়ও অনুভব না করে পারত না। ভাবত এবং বলাবলি করত—ছেলেটি জীবনে একটা কেউকেটা হবেই। সৌরীন চক্রবর্তী নিজেও তাই ভাবত। তার বাক্য ছিল বঁড়শীর মত বাঁকা এবং সূঁচের মত চোখা। উনিশশো আটত্রিশ উনচল্লিশ সালে—সে মনে মনে নিজেকে শেষের কবিতার অমিট রায়ের কল্পনার নিবারণ চক্রবর্তী মনে করত। বন্ধুবান্ধবেরা ওই নামটাই তাকে দিয়েছিল—সে সেটা সূক্ষ্ম মুখে হাস্য টেনে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণও করেছিল।

পাটনা আমার মামার বাড়ি। শীতের সময় সেখানে বছরে একবার করে যেতাম। সাহিত্যিক হিসেবে তখন আমার খ্যাতি সদ্য সদ্য হচ্ছে। ছেলেদের মহলে সমাদর পাচ্ছি। আমি সেখানে গেলে ছোট ছোট দলে ছেলেরা আসত। ১৯৩৭-৩৮ সাল—আমারও বয়স তখন চল্লিশ-একচল্লিশ। তরুণদের সঙ্গে মিশতে ছন্দপতন ঘটত না। এসব কথা আমি ছেলেদের কাছ থেকেই শুনেছিলাম। সৌরীনের সঙ্গে আলাপ তখন হয়নি। সে আসত না। ছেলের দলের পাণ্ডা গুণীন্দ্র আমাকে বলেছিল তার কথা। শুভেন্দু বলে তরুণ লেখকটি আমার ভক্ত ছিল। সে একদিন আমাকে—বলেছিল—'এখানে একটা দল আছে—তারা আপনাকে গ্রাম্য বলে ;—লাউড বলে।' মধ্যপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে গুণী হেসে বলেছিল—ও নিবারণ চক্কোত্তির কথা ছাড়।

—নিবারণ চক্কোত্তি—?

আমরা নাম দিয়েছি। ওর আসল নাম—সৌরীন চক্কোত্তি।

গুণীর কাছ থেকেই সবিস্তার শুনেছিলাম—সৌরীন চক্কোত্তিও একদিন এসেছিল আমার কাছে। কথা খুব বলেনি। প্রায় চুপচাপ বসে সিগারেট টেনেছিল এবং আমার সঙ্গে অন্যদের কথাগুলিই শুনে গিয়েছিল। বুঝতে আমার বাকী থাকেনি যে, আমার সামনে অন্য

ছেলেরা সিগারেট খায় না কিন্তু ও খাচ্ছে আমাকে অবজ্ঞা করবার জন্য এবং আমার কথাগুলি নীরবে শুনে যাচ্ছে আমাকে তার মনের কষ্টিপাথরে যাচাই করবার জন্য।

তারপর দু-বৎসর আর সৌরীনের সংবাদ বিশেষ রাখিনি। কেউ দেয়ওনি। কারণ দেওয়ার মত সংবাদ ছিল না সৌরীনের বা নিবারণ চক্রবর্তীর! কারণ এর পর এম. এ. পরীক্ষায় পাসের খবরটা তার পরিচিত মহলে উল্টো বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ পরীক্ষায় সে আদৌ অসাধারণ বলে নিজেকে প্রমাণিত করতে পারেনি। মুড়ি-মিছরির মধ্যে মিছরি না হয় বলা যায় কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। এবং মিছরির দামও সেকালে গণ্য করার মত ছিল না। সংসারে মানুষের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ সবই আছে, অস্বীকার করা যায় না এ কিন্তু তাকেই মানুষ বড় করে তোলে না। তুললে মানুষ হত না। সৌরীন চক্রবর্তীর পরীক্ষার ফলে সমাজে যে উল্টো বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে এই কারণেই উল্লাসের পরিবর্তে বেদনাই অনুভব করেছিল সকলে। কথাটা কেউ কাউকে উৎসাহের সঙ্গে দেয়নি, দিতে চায়নি। চল্লিশ সালে, আমার তখন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তখন আর আমার বছরে বছরে শীতকালে পাটনা যাওয়া ঘটে না। সে সময় গুণীর সঙ্গে সৌরীন কলকাতায় এসে একবার আমার কাছে এসেছিল। সেবার আর সে আমার সামনে সিগারেট খায়নি বা স্বপ্নালু নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখেনি কি নীরবে কথাবার্তা শুনে যায়নি। কথাবার্তা নিজেই বলেছিল। আমি তাকে আপনি বলে কথা বলতে সে হেসে সবিনয়েই বলেছিল—গুণীকে আপনি তুমি বলে কথা বলছেন —আমাকে আপনি বলছেন কেন?

এতে খুশী হওয়া স্বাভাবিক। খুশী হয়েছিলাম। অনেক কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গে। আমার লেখা তার ভাল লেগেছে একথা বারবার করে বলেছিল। আলোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত কুশল এবং অন্য প্রশ্নও আসে, সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কি করছ এখন?

হেসে বলেছিল—কিছু না।

গুণী বলেছিল বেচারীর বি-এ, এম-এ পরীক্ষার ফল ভাল হল না। মানে যা expect করেছিল—তেমন কিছুই হল না। কি করবে ভাবছে। আমরা বলছি ও university পরীক্ষার ফল কিছু নয়। তুমি Competitive examination দাও। I. C. S.। তাও বলছে —না।

বলেছিলাম—কেন?

সৌরীন হেসে বলেছিল—এটাকে মানতাম না এখন মানি। বলে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে কপাল স্পর্শ করেছিল।

এরপর কিছুদিন সৌরীনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে চেয়েছিল যেন। কিছুদিন ধরে সে পত্রালাপ চালিয়েছিল। পত্র লিখত নিয়মিত। প্রথম পত্রটা আজও মনে পড়ছে। সম্বোধনে শ্রীচরণেষু, লিখে প্রথম ছত্রেই লিখেছিল—কাকা আমার প্রণাম নেবেন। আমার পত্র পেয়ে কিছুটা বিস্মিত হবেন এবং সম্বোধন ও প্রথম ছত্র পড়ে খুবই বিস্ময় অনুভয় করবেন। বিস্ময় আমারও কম হয়নি। লিখবার সময় সানন্দ কৌতুক অনুভব করছি। কলিকাতা থেকে জীবনে বিফলতার হতাশার মধ্যে যখন আপনার কথা মধ্যে মধ্যে আমার মনে হচ্ছিল, তখনই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলাম যে, আপনি এবং আমি একই বংশোদ্ভূত এবং সম্পর্কে আপনি আমার কাকা হন। অবশ্য তফাত অনেক পুরুষের। আমরা ঢাকা বিক্রমপুর থেকে এখানে এসেছি তিনপুরুষ আগে। সেখানে এখনও আমার পিতামহের সহোদরদের বংশধরেরা বাস করেন। আমার ঠাকুর্দার ছোট ভাই বেঁচে আছেন সত্তর বছর বয়সেও সক্ষম মানুষ। তিনি গয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণে এসে আমাদের বাড়িতে উঠেছেন। জন্মেছেন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীতে কিন্তু বাঁচাটা তো পুরো বিংশশতাব্দীতে। তবু লোকটি এইটিন্থ সেঞ্চুরীর শেষ ভাগ কিম্বা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীর প্রথমার্ধের লোক। গোঁড়া হিন্দু। মনে মনে বঙ্কিমচন্দ্রেরও আগের মানুষ। ইংরিজী জেনেও জানেন না।

পড়েন না। ভুলেই গেছেন। সকাল থেকেই ধর্মের আচার আচরণ নিয়ে থাকেন। গায়ে জামা পরেন না। দারুণ শীতেও না। নিজে হাতে রান্না করে খান। তার উনোন পর্যন্ত রান্না চড়াবার আগে গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিতে হয়। আমাদের উনোনেও রান্না করে খাবেন না। আমার মা একটা তোলা উনোন দিয়েছেন। স্নান না করে তিনি শ্বশুরের কোন কিছু ছোঁন না।

শুধু এই নয়, কথায় বার্তায় তাঁর সব সে কাল এবং পরকাল। বাবার সঙ্গে বসে সে কালের কথাই আলোচনা করেন। কৌতুক এবং কৌতূহল বলেই আমি তাঁর কাছে বসে গল্প শুনি। একটা সত্য উপলব্ধি করলাম এই যে, মানুষটি বড় শান্ত এবং ততোধিক শক্ত। সহ্যশক্তি অসীম বলে শোনা যায় কিন্তু দেখা যায় না। এঁর মধ্যে সেটা দেখলাম। মুখে একটি প্রসন্ন স্মিত হাসি আছে সেটি শিবের কপালের এককলা চন্দ্ররেখার মত লেগেই আছে তার উদয় বা অস্ত নেই।

এই এঁর কাছে একদিন একটি বিচিত্র জিনিস দেখলাম। প্রকাণ্ড বড় ম্যাপের মত সাইজের একখানা কাগজ। পুরানো অনেকদিনের জিনিস, তলায় আটা দিয়ে কাপড় সাঁটা। ইতিহাসের পৃষ্ঠার বংশ-বিবরণীর মত বংশ-বিবরণী। উনি নাম বললেন কুর্শীনামা। কথাটা আমিও শুনেছি কিন্তু মনে ছিল না। জিনিওলজি এবং তার বাংলা প্রতিশব্দ বংশ-বিবরণী কথাটাই মনে ছিল। বললেন—আমাদের রামেশ্বর চক্রবর্তীর কুর্শীনামা। উনি দেখাচ্ছিলেন বাবাকে সেই আমাদের গোত্রের আদি ঋষি শাণ্ডিল্য থেকে আরম্ভ। একে একে অন্য শাখাকে বাদ দিয়ে রামেশ্বর চক্রবর্তীতে এসে তাঁর থেকে গোটা বংশটির একটা পূর্ণ বিবরণ।

বৃদ্ধ এই কর্মটিকে আজীবন নাকি নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছেন। শুনলাম সংবাদ রাখতে উনি অনেক টাকার পোস্টেজ খরচ করে থাকেন। রিপ্লাই পোস্টকার্ডে পত্র দেন রামেশ্বর চক্রবর্তীর সন্তানদের—। অনুরোধ করেন তাঁদের সন্তানাদির বিবরণ যেন অনুগ্রহ করে জানান।

একবার দুবার তিনবারও লেখেন। উত্তর সব ক্ষেত্রে পান না; না পেলেও যাঁরা উত্তর দেন তাঁদের কাছ থেকেও নিরুত্তর জ্ঞাতিদের সংবাদ সংগ্রহ করেন। মধ্যে মধ্যে পরিচিত জ্ঞাতিদের বাড়ি গিয়ে এসেও খবর নিয়ে কুর্শীনামা সম্পূর্ণ করেন।

বিস্তৃত বা বিপুল বিস্তার ব্যাপার। জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেস থেকেও বিস্তার বেশী। বংশ তো এক থেকে দুই থেকে চার নিয়ম মেনে চলে না। আমার ঠাকুর্দার চার ছেলে। আমার বাবার পাঁচ। অবশ্য নিঃসন্তান নির্বংশও অনেক হয় কিন্তু তার চেয়ে বংশবৃদ্ধির সংখ্যা বেশী। আমি বিস্ময়ের এবং কৌতূহলের বশে বেশ মন দিয়েই দেখে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নিচের দিকে একটা নাম দেখে থমকালাম। নামটা আপনার নাম। পাশে লেখা (নবগ্রাম বীরভূম বড় লেখক)। কিছুক্ষণ, লেখা শব্দ কয়েকটার দিকে তাকিয়ে থেকে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, ইনি আমাদের বংশের লোক ? তিনি বললেন, কে ? বললাম এই যে! ঝুঁকে পড়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ গো! ভদ্রলোকের আজও চশমা লাগে না।

তারপর বললেন—এদের সঙ্গে তো বেশী ছাড়াছাড়ি নয় আমাদের। পাঁচ পুরুষ আগে শিব চক্রবর্তী। তার বারো জন সন্তান। চার বিবাহ। তার মধ্যে বাড়িতে যে পত্নী থাকতেন তার তিন পুত্র। একজন কৃষ্ণচন্দ্র একজন রামচন্দ্র একজন ইন্দ্রচন্দ্র কনিষ্ঠ রাজচন্দ্র। আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ। আমার পিতামহ। তিনিই ভিটেতে ছিলেন। রামচন্দ্র কুলীন সন্তান হিসেবে বিবাহ করেছিলেন পাঁচটি। তার মধ্যে নবগ্রাম সরকার জমিদারদের বাড়িতে একটি আর কুঞ্জঘাটায় একটি আর একটি বাঘডোলায়। সেও ওই রাঢ় অঞ্চলে। এই তিন শ্বশুর বাড়িতেই তাঁর স্থান ছিল অধিকাংশ সময়। এই নবগ্রামে তাঁর দুই পুত্র। সম্পর্কে আমার তোমার পিতামহের খুল্লতাত। তাঁরা দুই ভাই মাতুলালয়ে বাংলা এবং ফরাসী পড়ে সে আমলে উকিল হন। জমিদারী জমি পুকুর কিছু মাতামহ দিয়েছিলেন। তারপর এঁরা

নিজেরা উপার্জন করে বেশ সঙ্গতিপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। এই দুই ভাইয়ের কনিষ্ঠ যিনি তাঁর নাম দীনদয়াল! তাঁর একটি পুত্র, নাম হরিদাস। হরিদাস সম্পর্কে তা হলে আমার দাদা। তোমার বাবার জ্যেঠা বা কাকা হবেন। তাঁর ছেলে ইনি। এখন বড় লেখক হয়েছেন। সম্পর্কে তোমার বাবার ছোট ভাই। তোমার খুল্লতাত।

সত্য কথা বলতে ভারী আনন্দ হল এবং হয়েছে আমার। যখন আপনি এখানে এলেন আপনার সঙ্গে আমি প্রথম দেখা করি তখন অতি আধুনিকতার নেশায় ইংরিজীয়ানার অহঙ্কারে দম্ভে আপনাকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছিলাম ; সজ্ঞানেই। ঠিক স্বভাব বা অন্যমনস্কতা বশে নয়। আপনি তা লক্ষ্য করেছিলেন তাও আমি জানি, গুণীদের দু'এক জনের কাছে তা' বলেওছিলেন, তাদের কাছ থেকে সেও শুনেছিলাম। তাবপর আপনার হল অভ্যুদয়। স্বীকৃতি পেলেন প্রায় সকলজনের। পরপর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আমারও ভাঙল অহঙ্কার। এবং সত্য বলব আপনার লেখা ভাল করে পড়ে দেখে ভালও লাগল। ওটা অবশ্য হয় এটা আপনিও মানবেন। যা নতুন, যা অভ্যস্ত স্বাদ ও গন্ধের থেকে পৃথক, তার স্বাদ গন্ধে অভ্যস্ত না হলে ঠিক তাকে ভাল লাগানো যায় না। একদিন একজন অধ্যাপক ভারী ভাল কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন দেখ "অবনীন্দ্রনাথ যখন ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রবর্তন করলেন তখন তার সুকুমার রূপটি অতি অল্প লোকের চোখেই ধরা পড়েছিল। অধিকাংশ লোকই তাকে খারাপ বলেছিল তাকে ব্যঙ্গ করেছিল। ক্রমে লোকে দেখে দেখে যখন অভ্যস্ত হল তখন তার রূপকে আবিষ্কার করলে! এঁর সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা। আজ যা বলছ বা যে মত পোষণ করছ সেটা হল তোমার এতকালের গল্প উপন্যাসের সে স্বাদ গ্রহণে তুমি অভ্যস্ত সেটা থেকে তৈরী। ক্রমে নতুন স্বাদে অভ্যস্ত হলে দেখবে যে, মত পালটাবে। তখন সঠিক বিচার করতে পারবে।"

আমার সত্যি সত্যিই তাই ঘটেছিল। নইলে পরীক্ষার ব্যর্থতায়

লজ্জা যতই হোক, দম্ভে যতই আঘাত লাগুক আপনার কাছে বিনত না বিনীত হবার মত মানুষ আমি নই। মত বদ্‌লেছিল সেইজন্য। সেই কথাটা বলতেই গিয়েছিলাম সেদিন গুণীর সঙ্গে। কিন্তু বিনয় প্রকাশ করেও ঠিক মনের কথাটা বলতে পারি নি। আপনার মনের কাছেও ঠিক যেতে পারিনি। আপনিও কি কাছে পৌঁছুবার মনের দরজাটা খুলেছিলেন? মনে হয় খোলেন নি। অন্ততঃ আমি যেন খোলা পাই নি। ভিতর থেকে খিল হয়তো দেওয়া ছিল না, ততখানি ছোট আপনি নন; হয় তো ভেজানোই ছিল কিন্তু আমি ওই দেখেই নিরস্ত হয়েছিলাম—সে দরজায় হাত দিইনি। বাইরে থেকেই ফিরে এসেছিলাম। মনে এ নিয়ে একটা কিছু কাঁটার মত খচখচ করছিল। তাই হঠাৎ এই সংবাদ বা তথ্যটা জেনে আনন্দের আর শেষ নেই আমার। আপনি আমার কাকা। আমার জ্ঞাতি, এক বংশে আমাদের জন্ম। গৌরবও বোধ করছি মনে মনে। আমার পিতামহটি বললেন—পাঁচ পুরুষ তফাত তোমার সঙ্গে এখনও তাঁদের সঙ্গে আমাদের দশ-রাত্রি অশৌচ হয় শাস্ত্র অনুযায়ী।

চিঠি অনেক বড় হয়ে গেল। মনের আবেগে লিখে ফেললাম। প্রণাম জানাচ্ছি।

ইতি—
প্রণতঃ
সৌরীন।

সুরূপার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ওর মুখে ওই সুতপা নাম শুনে সৌরীনের কথাই বেশী ক'রে মনে পড়েছিল। সুতপাকে যতটুকু জানি আর সুরূপাকে যেটুকু সেদিন টি-বি হসপিটাল পর্যন্ত দেখেছিলাম—তাতে সৌরীনকেই মনে পড়বার কথা। এবং সুতপার সুরূপা হওয়ার কাহিনী যাই হোক যত বিচিত্র এবং বিস্ময়কর হোক—সৌরীনকে না জানলে না বুঝলে কার্যকারণ ঠিক বোঝা যায় না। কার্যকারণ দূরেই থাক—জীবনে ওটা খুব বড় নয়। বড় যেটা ঘটে সেইটে। সুরূপার

কথা যখন লিখতে বসেছি তখন ঘটনা ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখতে গিয়েও সেই ঘটনার টানেও সৌরীন এসে পড়ছে। ফাইল থেকে খুঁজে সৌরীনের চিঠিগুলি বের ক'রে দেখছি। প্রথম চিঠিখানা আগাগোড়াই তুলে ধরলাম।

এ পত্রের উত্তর আমিও দিয়েছিলাম। নকল নেই—তবে খুসী হয়েই পত্র দিয়েছিলাম। এরপর সৌরীন—বছর দুয়েক নিয়মিত পত্র লিখেছে। তার মধ্যে সাহিত্যের আলোচনা—সমাজের সমালোচনাই বেশী। কাকা এবং ভাইপোর মধ্যে পত্রালাপ ঠিক নয়—। সম্বোধনে শ্রীচরণেষু থাকলেও—পত্রালাপ প্রকৃতপক্ষে দুই প্রীতিভাজন ব্যক্তির তত্ত্বালোচনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিগত খবরও থাকত। একবার বছর খানেক পর দেখছি—নিজের ব্যর্থতা সম্পর্কে আক্ষেপ ক'রে পত্র লিখেছিল—জীবনের আশা ভরসা বলতে গেলে নির্মূল হয়ে গেল। আপনাকে জানাইনি—দুটো পরীক্ষা এবার আমি দিয়েছিলাম! খুব খেটেছিলামও। কিন্তু দুটোতেই ব্যর্থ হয়ে গেলাম। আই-সি-এসেও ফেল করেছি। পি-সি-এসেও খুব নিচে প্লেস, তাতে চাকরি হবে না। এমন কি—সার্কেল অফিসারিও ভাগ্যে জুটবে না। ভাবছি এমনটি কেন হল? অথচ পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আলাপ করে নিজে বুঝেছিলাম—তাদের থেকে আমি সব দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ। শুধু আমিই ভাবিনি। সব পরীক্ষার্থীরাও ভেবেছিল। কারণ এক হ'তে পারে কপাল—আর একটা হতে পারে—সেটা বললে—পরীক্ষকদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে হয়। কথাবার্তা আমি ভাল বলি—সে জানেন—অথচ মৌখিক পরীক্ষাতেই ফেল করেছি শোচনীয়ভাবে। এখন ভাবছি কি করব! বাড়িতে মা বাপ বিরূপ হয়ে উঠছেন আমার ব্যর্থতায়। মধ্যে মধ্যে ভাবছি—ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে যা হোক সামান্য একটা কিছু অবলম্বন ক'রে সাহিত্যের কাজ করব। কিন্তু তাতেও ভরসা কোথায়?

আমার নিজের মনই নিজেকে ব্যঙ্গ করে বলছে—সেখানেও তুমি ফেল করবে। জিজ্ঞাসা কয়েকবারই করেছি—কেন এমন কথা বলছ উত্তর পেয়েছি—যে দেশের জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ পথ হল ভক্তির চ্যাট্‌চেটে কাদার পথ, দেশের সাহিত্যে মূল্য নির্ণয় হয় পাঠকের দীর্ঘনিশ্বাসের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে এবং পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়-বেদনা উদ্‌গত লোনা চোখের জলের পাউণ্ড বা সের মাপ করে—সে দেশে তুমি কি লিখবে ? তোমার লেখা সেতো শুকনো বুদ্ধিবাদের লেখা। যে দেশে বুদ্ধির পরিমাণ মোটমাট একআনা—আধ আনা—হয় তো বেশীই বলা হল, সে দেশে ষোল আনা মূল্য দিতে তারা পাবে কোথায় ? নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত ছিলেন ক্ষুরধার বুদ্ধি,অগাধ পণ্ডিত কিন্তু তাতে তাঁকে কেউ মানেনি। কিন্তু যেই ক-উচ্চারণ করতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে চোখের জলে বুক ভাসালেন—সেই ম্যাজিক হয়ে গেল। নবদ্বীপ তো নবদ্বীপ—বাংলা দেশ লুটিয়েপড়ল পায়ের তলায়, চোখের জলে নবদ্বীপ ভেসে গেল—শান্তিপুরেরও ডুবু ডুবু অবস্থা।

থাক এ সব কথা। এসব কথা সম্ভবতঃ আপনার ভাল লাগবে না। আজকে চিঠি শেষ করছি। প্রণাম নেবেন!” প্রণতঃ সৌরীন।

এর আটমাস পরের চিঠি একখানায় সৌরীনের পরিণতির খবর রয়েছে। মস্ত বড় চিঠি। ছ-সাত পৃষ্ঠা। সংবাদ তুটি। একটি হ’ল—সে আপার ডিভিসন ক্লার্কের চাকরিতে ঢুকেছে এবং সে বিয়ে করেছে। তুটি প্রায় এক সঙ্গে। চাকরিতে ঢুকেই বিয়ে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সংসার পেতেছে।

বিবাহ অসবর্ণ, প্রেম তাদের হয়েছিল, চাকরির অপেক্ষায় বিবাহ করতে সাহস করছিল না। কিন্তু আর ধৈর্য ধরা সম্ভবপর হয়নি ; ওই ক্লার্কশিপ চাকরি নিয়েই বিয়ে করেছে।

লিখেছিল—বাবা মা—ক্ষমা করেননি। তা নিয়ে কোন তুঃস্বপ্ন বা তুর্ভাবনা আমার নেই। অভিসম্পাতে বিশ্বাস করি না। আশীর্বাদেও না। তবে অভিসম্পাত কটু মনে হয় সহ্য করা যায় না। আশীর্বাদ বড়

মিষ্টি লাগে। আশীর্বাদ করবেন আপনি—এ আশা আমি করি।

আশীর্বাদ আমি করেছিলাম। এরপর দু-চারখানা পত্র সে লিখেছিল—তারপর লেখা বন্ধ করেছিল। আমিও উদ্বিগ্ন হইনি। সংসারের নিয়মে যেমন ভুলে যায় তেমনিই ভুলে গিয়েছিলাম। এটা উনিশশো একচল্লিশের কথা।

এর এগারো বছর পর—১৯৫২ সালে পাটনা গেলাম। এ এগারো বছর পাটনা যাইনি। ১৯৫২ সালে পাটনা গিয়ে দেখলাম—সুতপাকে। দশ বছরের সুতপা।

॥ চার ॥

১৯৫২ সালে পাটনায় গেলাম প্রায় এগার বছর পর। এর মধ্যে আর যাইনি। যাওয়া ঘটেও ওঠেনি; এবং আকর্ষণও কমে গিয়েছিল। মামাদের স্নেহ কমেছে বললে পাপ হবে। অর্থাৎ অপরাধের চেয়েও বেশী কিছু হবে। তবে তাঁদের সংসার বেড়েছে এবং আমার জীবনেও কাজ বেড়েছে। সে কালের মত সাহিত্যক্ষেত্রে যশোপ্রার্থী নই আমি যশে নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। এবং কোনখানে ঠিক নিজের ইচ্ছেতে যাইনে,তার মনও নেই অবসরও নেই। অনেকে অপবাদ দিয়েছিল পেশা সভাপতিত্ব হয়েছে আমার। তাঁরা খুব যে মিথ্যে বলেছিলেন তা নয়। এ নেশা পেয়ে বসলে এবং নেশা করবার মত মূল্য সম্বল থাকলে নেশায় মজতেই হয়এবং ক্রমে পেশাই দাঁড়িয়ে যায়। জীবনের সায়াহ্ন অনেক দেরী বয়স অনুসারে কিন্তু যেখানে রোগ এবং জীর্ণতা অকালে ধরে সেখানে বয়সের হিসেব চলে না। শীত বা বর্ষার বাদলের দিনের মেঘের ঘটায় বিকেলেই সন্ধ্যে প্রদীপ জ্বালার পালা এসে যায়। আমার অবস্থা বর্তমানে তাই। সেই হিসেবেই এই অকাল সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে অকপট চিত্তেই সেদিনের কথা স্বীকার করে যাচ্ছি। তখনও ফুলের মালা সম্বর্ধনা গুরুর মত সমাদর, মঞ্চে বসার অধিকার একটা মোহ বিস্তার করত। একা আমারই উপর করে তা নিশ্চয়ই নয়, অনেকের উপরই করে। এইটে যেখানে থাকত না সে সময়ে সেখানে যাওয়ার জন্যে মনে ঠিক তাগিদ থাকত না। এমন কি নিজের স্বগ্রামে যাওয়াও কমে গিয়েছিল তখন।

এতে সুখ কি তা আজ ভেবে দেখি। ভেবে দেখবার মন একটা এসেছে আমার এ কথা বলতে পারি। আজও ডাক আসে কিন্তু শরীর ভেঙেছে বলেই যে যাইনে তা নয়, ওই মালাপরা সম্বর্ধনার

কল্পনায় মন বিব্রত হয়। কিন্তু সে কথা যাক। তার সঙ্গে সুতপার কথার কোনই সম্পর্ক নেই। বলছি আমি সুতপার কথা।

১৯৫২ সালে পাটনায় একটা বেশ সমারোহের আহ্বান পেয়েছিলাম। বেশ সমারোহ বলছি এই কারণে যে, এক সঙ্গে কয়েকটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান এবং হিন্দী সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম।

উঠেছিলাম গিয়ে মামাদের ওখানেই। আমাকে নিয়ে তাঁদের ঝঞ্ঝাট হয়েছিল অনেক! আমার ঝঞ্ঝাট তো বেশী নয়, ঝঞ্ঝাট আমার কাছে যে সব লোকেরা আসছিলেন তাঁদের নিয়ে।

আমি নিজে থেকেও দু-তিন জায়গায় গিয়েছিলাম। প্রথম আমার শচী মামার কাছে। পাটনার বাঙালী সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতীক। তাঁকে শ্রদ্ধা করি ভক্তি করি নিজের মামাব মত। গুরুর মত সম্ভ্রম করি। বিরাট মানুষ। তাঁর অনেক বয়স হয়েছে তখন; জীবন যুদ্ধে হার মানবার মানুষ নন, কিন্তু ক্লান্ত নিঃসন্দেহে। তবু তিনি আসবার আগেই আমি ছুটেছিলাম। শচী মামা পাটনায় সর্বজনমান্য ব্যক্তি। দেহে বয়সে ক্লান্ত কিন্তু আমি জানতাম যে, তিনি নিজেই এসে মোটা ভরাট গলায় ডাকবেন—ভাগ্নে। কখন এলে—কেমন আছ? মামাদের সব ভুলে গেলে নাকি? সে আমি হতে দিই নি। প্রথম দিনই গিয়েছিলাম সেখানে।

সেখান থেকে ফিরে এসে দেখলাম গুণীরা দল বেঁধে বসে আছে। গুণীও তখন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েছিল, রাজনীতিতে নাম করেছিল; পাটনায় পি-এস-পি দলের ভি-আই-পি না-হলেও নামীকর্মী।

গুণীই বললে সৌরীন এই মাত্র চলে গেল।

সত্য বলতে সৌরীনকে ঠিক মনে আমার ছিল না। ৪০।৪২ সালের কয়েক মাসের পত্রালাপের মধ্য দিয়ে যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল জ্ঞাতিত্বের কাঠামোর উপর যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল সে এই

কয়েক বছর প্রায় এগার বছরের উপর সময়ের মধ্যে বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়েছিল।

এর মধ্যে পাটনার লোক মামার বাড়ির লোক এসেছেন, কিন্তু সৌরীনের নাম ওঠেনি। একেবারে গোড়ার দিকে নাম তার উঠত। মনে আছে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ সালে ন-মামা এসেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হ্যাঁ রে, সৌরীন নাকি তোমাদের জ্ঞাতি, সম্পর্কে নাকি ভাইপো ?

প্রশ্ন করেছিলাম, বলেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ। এখন আমাকে দাদু বলে তোমার সম্পর্ক ধরে। ডেকে কথাবার্তা বলে। ওতো খুব নাক-উঁচুই ছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাউকে ও বড় বলে স্বীকারই করত না। যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা সে সবই ইউরোপের উপর।

—জানি।

—তোমাকে তো লেখক বলে স্বীকারই করত না। জান তো ?

—তাও জানি।

হেসে ন-মামা বলেছিলেন—এখন কিন্তু খুব ভক্তি তোমার উপর। আমি সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমার এ মত তো ছিল না হঠাৎ সম্পর্ক বের হতে মত বদলালো নাকি। তা বললে, না। সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্ক কি মতামতের ? এই তো বাবার সঙ্গে মার সঙ্গে বনেনি আমার। মতে বনল না, আমি পৃথক হয়ে গেছি। জানতো ও অসবর্ণ বিয়ে করেছে। একটি বস্তির মেয়েকে বিয়ে করেছে।

বলেছিলাম, তাও জানি। সৌরীনের মত সে জন্যে বদলায়নি। সে ধরনের ছেলে ঠিক নয় সে।

—হ্যাঁ ছেলে ভাল। বরাবর ছেলে ভাল। কিন্তু শেষের দিকটায় পরীক্ষাগুলোতে কি করলে ? একটাতে দাঁড়াতে পারল না। শেষ পর্যন্ত আপার গ্রেড ক্লার্কের চাকরি নিয়ে ঢুকেছে বেহার সেক্রেটেরিয়েটে। আলাদা বাসা করেছে। একটি মেয়ে হয়েছে।

এই পর্যন্ত। না তারপরও বোধ হয় ফণি একদিন সৌরীনের কথা বলেছিল—একদিন একটা সভায় একজন অধ্যাপক আপনাকে আক্রমণ করেছিল। সৌরীন তাকে নাজেহাল করেছে সভায়।

এই সঙ্গেই শুনেছিলাম তার চাকরি জীবনের কথা। চাকরি নাকি সে খুব মন দিয়ে করছে। এবং উপরের কর্তাদের নজর পড়েছে তাব উপর। উন্নতি ওর হবেই।

বলেছিলাম—বাঃ।

ফণি বলেছিল—হ্যাঁ সেদিকে বাঃ বলতেই হবে। বেহারে বাঙালীর ছেলেব বেহারী কর্মচারীদের ছাড়িয়ে নজরে পডা চাড্ডিখানি কথা নয়। কিন্তু ওর যে একটা কেবিয়ার হবে আশা করেছিলাম—সে আর হবে না। বললে বলে কি জানেন—হাসে। বলে—ওসব হল ভাগ্যবানদের জন্য। আমাদের জন্য নয়।

কথা ওইখানে চাপা পড়েছিল।

তারপব থেকে চাপাই পড়ে রইল—আব কোনদিন কোন সূত্রে উপরের বিস্মৃতির মাটি ধুলো পড়ল না—নড়ল না। ক্রমে ক্রমে ভুলেই গিয়েছিলাম—সৌরীনের কথা। সেদিন হঠাৎ সৌরীনের নাম শুনেও এক মুহূর্তে মনে পড়েনি সৌরীনকে। একটু ভাবতে হল। সৌরীন? মুহূর্ত পরেই পাটনা বসে আছি—ফণি কথা বলছে সুতবাং মনে পড়ে গেল সৌরীনকে।

বললাম—ও—আচ্ছা। সৌরীন এসেছিল?

—হ্যাঁ মেয়েকে সঙ্গে করে এসেছিল কিন্তু অপিস বেরুবে—চলে গেল—বলে গেল পরে দেখা করবে।

সেদিনটা শনিবার এবং একটা ছুটির দিন ছিল। শনিবার ছুটির সুযোগ নিয়ে শনি, রবি তুদিনের মধ্যে অনুষ্ঠানগুলি শেষ হওয়ার কথা। বললাম—আজ তো ছুটি না? আজ অপিস?

ফণি বলেছিল—সৌরীনের ছুটি নেই। ও ছুটির দিনেও কাজে যায়। এখন ও প্রোমোশন পেয়ে এ্যাসিট্যান্ট সেক্রেটাবীর কাজ

করছে। মিনিস্টারের ওকে না-হলে চলেই না। মানে একটা জেদ আছে ওর। অন্ততঃ ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে তবে ও রিটায়ার করবে। আপনার কাছে এসেছিল—এটাই আশ্চর্য।

মনে আমারও একটু আবেগ স্পর্শ করলে। মনে পড়ে গেল সৌরীনকে। প্রশ্ন করলাম কখন আসবে বলে গেছে? আবার এসে ফিরে যাবে?

ফণি হেসে বললে—সে ঠিক আসবে। সময় করে নেবে। সে তার বাড়িতে একটি অনুষ্ঠান করবে। রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ, ঘরোয়া ব্যাপার যদিও—। আমাকেও বলে গেছে। সময়ের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। ওর ঘরের ফাংশন খাওয়া দাওয়া সে একটা ভারী লোভের ব্যাপার।

—খাওয়ায় বুঝি ভাল? কিন্তু খাওয়া ভাল হলে আমার বিপদ যে!

—নিশ্চিন্ত থাকুন। সৌরীনের বাড়িতে খেয়ে কারুর অসুখ করে না। ওর স্ত্রী দুর্লভ মেয়ে। নিজে হাতে রান্না করেন। আর বিলিতী মুঘলাই থেকে বাংলা দেশের সুক্তো এবং দই ইলিশ পর্যন্ত নিখুঁত রাঁধেন। আর তেমনি গান করেন। মেয়েকে নাচ শিখিয়েছেন। চমৎকার নাচে মেয়েটি। সুন্দর। আমাদের ফাংশনেও ও নাচবে। পাটনার যে-কোন ফাংশনে সে বাঙালী হিন্দী যাদের হোক—সুতপাকে ডাকবেই এবং সুতপা যাবেই। মানে সুতপা পাটনায় বিখ্যাত। এমন কি ওর ফ্যানও বিস্তর। বাড়িতে গেলেই দেখতে পাবেন সুতপা নেচে এর মধ্যে কত ট্রফি পেয়েছে। একটা সুন্দর কাঁচের শোকেশের মত আলমারীতে সাজিয়ে রেখেছে। দেওয়াল ভরা সুতপার নানান পোজের ফটোগ্রাফ। তাছাড়াও কোনটিতে চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে কোনটাতে অন্য মিনিস্টারের সঙ্গে তোলা ছবিও আছে।

সেই দিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে একটি সুন্দর লাবণ্যময়ী মেয়ে আমার

গলায় মালা দিয়ে কপালে চন্দন দিয়ে আমাকে বরণ করলে। নাচের সাজে সেজে রয়েছে, হাতে থালায় মালা চন্দনের বাটী ধান দুর্বা একটি প্রদীপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। যে ভঙ্গিতে এল তাকে ঠিক চলার ভঙ্গি বলা চলে না, নাচের ভঙ্গিই বলতে হয়। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। বাঁ হাতের তালুর উপর থালা বসিয়ে একটু বঙ্কিমঠামে এসে দাঁড়াল। এত ছোট মেয়ে বছর দশেকের মেয়েকে ছোটই বলতে হয়—কিন্তু তার হাত এতটুকু কাঁপছিল না।

ফণি পিছনের দিকে ছিল সে এসে পিছন থেকে কানে কানে বললে—এই সৌরীনের মেয়ে সুতপা।

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম তাকে। হ্যাঁ মেয়ে রূপসী মেয়ে হবে। এবং নৃত্যকলায় ওর এইটা সহজ অধিকার আছে। তার দিকে তাকিয়ে আমি একটু হাসলাম। সেও একটু হাসল। মালা দিয়ে চন্দন পরিয়ে মাথায় ধান দুর্বা দিয়ে সে চলেই যাচ্ছিল আমি ডাকলাম, শোন!

সে দাঁড়াল। আমি উঠে আমার গলা থেকে মালাটি খুলে তার গলায় পরিয়ে দিলাম। সভার সমবেত জনতার মধ্য থেকে খুব করতালি উঠল। মেয়েটি খুসী হয়ে চলে গেল।

আমি ফণিকে প্রশ্ন করলাম—সৌরীন কোথায়?

সভার দ্বিতীয় সারির একটা কোণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ফণি দেখিয়ে দিলে সৌরীন বসে আছে তার পাশে একটি ভদ্রমহিলা। বুঝলাম সৌরীনের স্ত্রী। আমি বললাম—ওকে ডাক। বল আমি ডাকছি।

হেসে ফণি বললে—ও আসবে না।

—কেন?

—না। ও আসে না ডায়াসের উপর। কিছুতেই আসে না। অথচ থাকে সব কিছুর মধ্যেই। অবশ্য জড়ায় না। তবে থাকে। এতেও সে অনেক কাজ করে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানের শেষে একটি কর্মসূচী ছিল আনন্দ পরিবেশন সাধারণতঃ এটিকে অন্যত্র সঙ্গীতানুষ্ঠান বলা হয়, কোথাও কোথাও আনন্দানুষ্ঠান বলেও থাকে। শব্দটি একটু নূতন। বাকী সবই সেই সঙ্গীত নৃত্য যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদি। আমরা বাইরে এসে বসলাম। প্রথম সারিতে আসন, পাশে ফণি এবং আরও কয়েকজন কর্মকর্তা। সৌরীনের সঙ্গে চোখাচোখী হল—সে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে হেসে অভিবাদন জানালে কিন্তু উঠে এল না। প্রথম আইটেমেই ছিল সৌরীনের মেয়ের নাচ।

সত্যিই ভাল নাচলে মেয়েটি। আমার দেওয়া মালাখানি গলায় দুলছিল। নাচলে আধুনিক নৃত্য নয়। ক্ল্যাসিক্যাল কথক নৃত্য। জমিয়ে অনেক প্রশংসা কুড়িয়ে চলে গেল। এর পর দুএকখানা গান শুনেই ফিরলাম। বেরিয়ে আসছি সৌরীন দরজার বাইরে এসে সকলের পিছনে দাঁড়াল। আমি দেখছিলাম। ডেকে বললাম এই যে সৌরীন। কেমন আছ?

এবার সৌরীন এগিয়ে এল সস্ত্রীক। প্রণাম করে বললে—কাল সকালে যাব। আটটার সময়। বলে আবার চলে গেল।

পরদিন আটটার সময় এল সঙ্গে মেয়ে। আরও কজন লোক ছিলেন। প্রণাম করে একপাশে বসল। আমি ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম— কাল খুব চমৎকার নেচেছ। এই বয়সে ভাল শিখেছ। বাঃ—!

সৌরীন বললে —এক মিনিট সময় হবে আপনার? একটা কথা বলেই চলে যাব। বেরুচ্ছি আপনার কাছে হঠাৎ ফোন পেলাম মিনিস্টার ডাকছেন।

উঠে গেলাম। সৌরীন বললে—আমাকে ভুলে গেছেন, না?

বললাম—ভুলিনি নিশ্চয়--কিন্তু যোগাযোগ না থাকলে তো আকর্ষণ থাকে না। লাটাইয়ে বাঁধা ঘুড়ি। ঘুড়ি মাটিতে পড়ে লাটাইও মাটিতে পড়ে-- টান কোথায়? টান থাকলে ঘুড়ি বোঝে

লাটাই আমার আপন জন, লাটাইও বোঝে ঘুড়িই আমায় টানছে—ওই আমার স্নেহের ধন।

হেসে সৌরীন বললে—বেশ বলেছেন খাসা বলেছেন—ঠকে গেছি আমি। আমার একটা কথা। রাখতে হবে কিন্তু।

—আমার বাড়িতে একদিন খেতে হবে। রাত্রে নয় দিনে। সকাল বেলা নিয়ে যাব ; সন্ধ্যেবেলা চা খেয়ে ছুটি।

ভেবে বললাম—কাল পর্যন্ত তো সময় নেই—সে তুমি জান। কারণ ফণি আমাকে বলেছে তুমি বাইরে এ সবের সঙ্গে যুক্ত এটা দেখাও না বটে তবে ভিতরে তুমি আছ এবং তুমি না থাকলে হয় না।

Thats good of Phani, ফণি এমন বাড়ছে, লীডার হয়ে উঠবে। যোগ্যতা আছে তার উপর এইটে আছে যার জন্যে সে স্বীকার করতে পেরেছে। একটু থেমে বললে—কিন্তু আমি যা বলছি তার কি বলুন? আমার জন্যে একদিন বেশী থাকুন। এইটে আমার দাবী। সারা দিন থাকবেন সন্ধ্যের পর মেলে আমি আপনাকে তুলে দিয়ে আসব। সেদিন এক্সক্লুসিভলি আপনি আমার। আমার কাকা। আমরা এক বংশের ছেলে। এক রক্ত রয়েছে আমাদের মধ্যে। রক্ত শুনেছি সব থেকে গাঢ় তরল পদার্থ। আমার সংসারের মধ্যে আপনাকে পেতে চাই।

আমি ভাবছিলাম। সে বলেই যাচ্ছিল—দেখুন প্রথম যৌবনে আমাকে দেখেছেন। আমার সে মন নিশ্চয় খানিকটা আছে। বংশ গৌরব টৌরব আমার জন্যে নয়। তবু আপনার আত্মীয় বলে দাবী করতে পারি এই জন্যেই বংশের কথা ভেবে আনন্দ পাই।

আমি বললাম—বেশ। কথা রইল—মঙ্গলবার। তবে টিকিট বার্থ রিজার্ভেশন এ সবের ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

—সে আমি করব। আমার বস্ মানে মিনিস্টারকে বলে করিয়ে দেব। দরকার হয় স্টেট প্রায়রটি নিয়ে দেব। এবং মিনিস্টারও খুব আনন্দের সঙ্গে করবেন। আপনার এ্যাডমায়ারার—সব বই পড়িয়েছি

আমি। বাড়িতে কিনে সাজিয়ে রেখেছেন। সে বিষয়ে আমি আপনার মস্ত দালাল।

বলে হাসতে লাগল সে। তারপর চলে গেল। সেদিন বেলা ছুটো থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান এক নাগাড়ে এক জায়গায় নয়, ছু জায়গায়।

হিন্দি সাহিত্যিকদের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে গিয়ে সৌরীনকে দেখলাম তার মিনিস্টার ছিলেন। আলাপ করিয়ে দিলে। সেখানেও সুতপা ছিল। আবার সন্ধ্যায় বাঙ্গালীদের অনুষ্ঠান সেখানে সেদিন নাটক ছিল,সুতপা সে নাটকেও ছিল। ছুই পুরুষ অভিনয় ছিল—তাতে সুতপা একটি ছেলে শ্যামা এবং বরুণের প্রথম সিনের পার্ট করলে। দেশ দেশ বন্দিত করি গানটি ও গাইলে। অভিনয় মন্দ করলে না।

এটা সৌরীনের বাইরের দিক। মঙ্গলবার বাড়িতে গেলাম ওর। বাড়িতে গিয়ে দেখলাম সৌরীনের ভিতরের দিকটা।

বাড়ির মধ্যে তিনখানা ঘর। সুন্দর করে সাজানো। চোখ জুড়িয়ে যায়। কোথাও এতটুকু মালিন্য নেই। স্বল্প সাধারণ বস্তুর আয়োজন সজ্জাকে অসাধারণ এবং বহুমূল্য বস্তুর প্রাচুর্য্যকে লজ্জা দেওয়া মনোরমতায় মণ্ডিত করে তুলেছে।

বললাম—বাঃ।

সৌরীন বললে—এটি আমার স্ত্রীর দান আমার জীবনে। ও বলছে ঠিক এই সময়েই এসে দাঁড়াল সৌরীনের স্ত্রী। দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণা মেয়ে, চোখ ডাগর। তবে ঘরের সজ্জার সঙ্গে অঙ্গ সজ্জা তার বিপরীত। লিপিষ্টিক পাউডার মেখে ভুরু আঁকা পর্যন্ত বাদ নেই। সেদিন সভায় দেখেছিলাম কিন্তু সভায় সেজে যাওয়া আর বাড়িতে এইভাবে সেজে থাকা এটা আর এক জিনিস। চুলগুলো পর্যন্ত কেটে সিঙ্গল করে ফেলেছে।

তবে প্রণাম করলে। সুতপা এল। সেও দেখলাম প্রসাধন

করেছে মায়ের মত, রুজলিপস্টিক শ্যাম্পু করা চুল সাদা-ফ্রক প্রভৃতিতে তাকে দেখাচ্ছিল প্রায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মত।

সেও প্রণাম করলে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সৌরীন প্রগলভ হয়ে উঠল। এই প্রগলভতার মধ্যে সেই তার প্রথম জীবনের সৌরীন আত্মপ্রকাশ করলে। এবার সে সিগারেট খাচ্ছিল আমার সামনে। আমি যখন কথা বলছিলাম তখন সেই প্রথম দেখা হওয়ার সময় সে যেমন নিস্পৃহভাবে সিগারেট টানছিল—ঠিক তেমনি ভাবেই সিগারেটের ধোঁয়ায় রিঙ ওড়াচ্ছিল।

সে তীক্ষ্ণতর বাক্য বিন্যাসে সকলকে কেটে কেটে চলেছিল। সাহিত্যে শিল্পে রাজনীতিতে সব ক্ষেত্রের সব প্রতিষ্ঠিত মানুষকে। কেবল আমার কথা বাদ দিয়ে।

আমাকে ডেকে এনেছে নিমন্ত্রণ করে এ কথাটা সম্ভবত তীক্ষ্ণভাবে সজাগ ছিল। সুতপা এবং তার মা উঠে গিয়েছিল। কথা চলছে এমন সময় টেলিফোন বাজল। সুতপা এসে ডাকলে—পা, মিনিস্টারের কল।

—মরেছে। বলে উঠে গেল সে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে বললে—আমাকে একটু দৌড়ুতে হচ্ছে। এই মিনিস্টারটি আমার এমন যে এর কাছে মরেও নিষ্কৃতি নেই। পরলোকের টেলিফোন নেই ও ঠিক শ্মশানে গিয়ে হাঁকবে—সৌরীন-সৌরীন আধঘণ্টা only for half an hour, come immediately. Very urgent. তবে আমাকে ভালবাসে। আমাকে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীতে অফিসিয়েট করতে নিয়েছে, বলেছে—পার্মানেণ্ট করবই তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

পোষাক পরাই ছিল। সৌরীন স্যুটপরেই থাকে চব্বিশঘণ্টা। শুধু জুতোটা পাল্টে চলে গেল। সুতপা এসে বসল এবার।

এরমধ্যে সুতপা বেশ বদলেছে। এবার পরেছে সালোয়ার পাঞ্জাবী। গলায় ওড়না ফেলতেও ভোলেনি।

বলতে সুরু করলে ওর নাচের গল্প। দেখাতে লাগলো ওর ট্রফিগুলো। চাবি বন্ধ ছিল ডাকলে—মামি, মামি, চাবিটা দাওনা। দাদুকে ট্রফিগুলো দেখাই।

—আমি যাচ্ছি।

ওর মা এসে ট্রফিগুলো দেখতে লাগল এবং সেই এবার মেয়ের গল্প করতে লাগল। বাকী কিছু রাখলে না, ছবিগুলো পর্য্যন্ত দেখালে।

সুতপা ছুটে গিয়ে এ্যালবাম নিয়ে এল। দেওয়ালে কতগুলি ছবি ধরবে? এ্যালবামে অসংখ্য ছবি। নৃত্যের অভিনয়ের। বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে। প্রায় একশোর উপর ছবি। ওর মা একবার রান্নার দিকে যাচ্ছিল আবার এসে কথা বলছিল। এর মধ্যে একটা কথা বারবার পুনরাবৃত্তি করলে। সেটা হল এখানে নাচ শেখানো সে এক অসম্ভব ব্যাপার। কার কাছে শিখবে? একটা লোক নাই। মানে টিচার। একটা ইনষ্টিটুশন নেই। অথচ ওঁর আমার তুজনের ইচ্ছে—ইচ্ছেটা অবশ্য ওঁর। নাচে জন্মগত দখল দেখে, ওকে নাচ শেখাই। আর ওঁর আমার তুজনেরই মত হচ্ছে যে নাচই হচ্ছে ফাইন আর্টের সেরা ফাইনেষ্ট থিং।

—এখন কার কাছে শিখছে।

সুতপা বললে—মায়ের কাছে। মা খুব ভাল নাচেন। খুব ভাল।

সুতপার মা হাসলে। লজ্জিত একটু হল। বললে—নাচ ভালবাসেন আপনি?

উত্তর দিলাম—সন্দেহ হচ্ছে কেন তোমার?

এবার বেশী লজ্জিত হল। এবং উঠে চলে গেল।

সুতপা আবার আরম্ভ করলে পা-মামি তুজনেই বলে—নাচ শিখিয়ে হোল ইণ্ডিয়া টুর করব। তারপর ইয়োরোপ যাব। ইয়োরোপ থেকে এ্যামেরিকা।

আমি বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক এমন আবহাওয়ার মধ্যে

এসে পড়ব জানা ছিল না আমার। হঠাৎ সুতপা বললে—আপনি তো আমার পার আঙ্কল-কাকা!

—হ্যাঁ।

আমার তা হলে Grandpa দাদু।

—হ্যাঁ তাই হয় তা হলে!

—হ্যাঁ বাবা বলেছেন দাদু বলতে।

ঠিক বলেছেন।

—তা হ'লে তো আমাদের খুব আপনজন?

—নিশ্চয়।

চুপ করে থেকে বললে—তাহলে আপনি আমাকে কিছু দেবেন না? আপনাব লোককে লোকে কত জিনিস দেয়।

- কি চাই বল?

চুপি চুপি বলব ওঘরে মা নইলে শুনে ফেলতে পারে। সে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে—একখানা টকটকে লাল রঙের বেনারসী শাড়ী দেবেন আমাকে। কেমন? নাচবার সময় যে সব পোষাক বাবা মা করে দিয়েছে সেগুলো ভালো না! দেবেন? দেবেন না?

ওর চোখের দিক চাইলাম। দেখলাম আশ্চর্য একটি করুণ দীনতা সেখানে ফুটে উঠেছে, হয়তো আরও কিছু ছিল। দুরন্ত লোভের একটা পরিচয় ছিল। কিন্তু তা সঠিক দেখবার জন্যে ততক্ষণ তাকিয়ে থাকিনি আমি।

আবার ও বললে আপনি বাজারে চলে যাবেন, হ্যাঁ, বলবেন একটু আসছি আমি। দোকানে গিয়ে বললে দেবে। বড় নেবেন না—ছোট নেবেন। হয়তো দুশো আড়াইশো টাকা দাম নেবে। তা আপনি বই লিখে অনেক টাকা পান। তাছাড়া আমি তো আপনার ভাইপোর মেয়ে, নাতনী। নাতনীকে দেবেন না? কাল গলার মালাটাই খুলে দিলেন। নয়? তারপর ফিরে এসে দেবেন আমাকে ডেকে। আমি

'না' বলব। মা 'না' বলবে। আপনি শুনবেন না। কেমন? বলবেন না যেন আমি চেয়েছি। বলবেন আমার ইচ্ছে হল। এমন সুন্দর চেহারা, এমন সুন্দর নাচে, আমি দাদু, আমি দিচ্ছি। কেমন?

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়েছিলাম। দশ বছরের মেয়ে সুতপা তখন!

—এই সময়ে চলে যান, নইলে বাবা এসে পড়বেন আর সঙ্গে যেতে চাইবেন। কিনতে বাধা দেবেন! ডাকব চাকরটাকে? একটা টাঙ্গা কি একা এনে দেবে?

বলেছিলাম—ডাক।

।। পাঁচ ।।

দোকানে আমি গিয়েছিলাম। ঠিক যেমনটি সুতপা বলেছিল—তেমনটিই বলে বেরিয়ে গিয়ে দোকান থেকে বেনারসী ঠিক নয়, নকল বেনারসী বা কমদামী ছোট বেনারসী শাড়ী ব্লাউসপিস কিনে এনেছিলাম। এবং ওই ভাবেই দিয়েছিলাম।

সুতপার মা অবশ্যই মুখে কয়েকবার আপত্তি করেছিল—এ কি, এ আপনি কিনে আনলেন কেন? না-না-না। এ-এ। এ যে কি? অর্থাৎ অন্যায় বা অশোভন বা কি-যেন সে খুঁজে পায় নি।

সুতপা গাড়ীর অর্থাৎ টাঙ্গার শব্দের জন্য কান পেতে বসে থাকেনি, পথের দিকে একটা জানলায় চোখ রেখে বসেছিল। আমি নামতেই ছুটে এসে আমার হাতের বাক্সটা টেনে নিয়ে খুলতে গিয়েও খোলে নি। বাক্সটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল—আমি ঘরে যাচ্ছি—আপনি আমাকে দেবেন, আমি মুখে বলব, নেব না। এ্যাঁ? তখনি আপনি মাকে ডাকবেন। বলবেন, বউমা—এটা আমি সুতপার জন্যে এনেছি। এ্যাঁ?

তাই-ই করেছিলাম। আমার মনে যত তিক্ততা জমেছিল—তার মধ্যে খানিকটা ঘেন্নাও ছিল—টাকা খরচের জন্য কিছুটা গ্লানিও ছিল কিন্তু তার সঙ্গে সমপরিমাণে তো বটেই, হয়তো কিছুটা বেশীই ছিল। বিস্ময় এবং কৌতূহল। মনে মনে ভাবছিলাম এ মেয়ে বড় হলে হবে কি? যার জীবনে ও নিজের স্থান করে নেবে তার জীবন যে বিষজর্জর করে দেবে। আরও ভাবছিলাম—এ প্রবৃত্তি ও পেলে কোত্থেকে? মা বা বাপ কোন্ দিক থেকে?

সুতপার মাকে যা বলতে হবে - সে কথাও সুতপা আমাকে আগে থেকেই তালিম দিয়ে রেখেছিল। কথাটা আমি নিজে খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে বলেছিলাম -এর মধ্যে তুমি কথা বলছ কেন বউমা?

ওর তুমি মা। আমি ওর দাহু, আমি যদি ওকে কোন কিছু কিনেই দিই—তবে তোমার আপত্তি অন্যায় এবং অশোভন দুই-ই হয় না কি? আমাকে তাহলে ঠিক আপনার ভাবছ না!

শেষ কথাটা আমার নিজস্ব। ওটা সুতপার শেখানো নয়। তবে ওইটেই মোক্ষম অস্ত্র! ওর মা চুপ করে গিয়েছিল। একটু পবে হেসে বলেছিল—তা হ'লে আজ তুমি কাপড় পরে রাধার অভিসাব নাচটা দাহুকে দেখিয়ে দাও। জানেন লাল বেনারসীর ওপর ওর ঝোঁক অনেক দিনের। ছেলেমানুষ তো, টকটকে রঙের উপর ঝোঁক। ওর রঙ বিচার করে ওই নাচের জন্যে ওর বাপ ওকে ফিকে নীল বেনারসী ছাপ দেওয়া ছাপানো শাড়ী কিনে দিয়েছে। কাল যেখানা পরেছিল। কিন্তু লাল বেনারসীর কথা বললেন—জানলেন কেমন করে?

আমি ভাবলাম ধরা পড়ে গেল বুঝি সুতপা! কিন্তু ওর মা দেখলাম ধরেও ধরলে না। আমি কৌতুক করে বললাম, দেখ মা, প্রেমে পড়লে মানুষ বোকা হয়, এইটেই একালের ধারণা। রবীন্দ্রনাথ চিরকুমার সভায়, গোড়ায় গলদ বা শেষরক্ষায় এ সত্যটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু আমি আবার বীরভূমের লোক, মানুর আমার বাড়ির পাশে, চণ্ডীদাসের পড়শী আমি। আমাদের ওদিকের লোক প্রেমে পড়লে বোকামী নিশ্চয় করে কিন্তু তার সঙ্গে প্রিয়ার মনের কথাও জানতে পারে। বুঝছ না? তখন প্রিয়ার তেষ্টা পেলে নিজের তেষ্টা পায়। আমার মনটায় ওর গোলাপী রঙ দেখে বারবার মনে হচ্ছিল ওকে একখানি রাঙা টকটকে বেনারসীর আবরণে লক্ষ্মীঠাকুরুনটির মত মানায় বোধ হয়। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রাঙা টকটকে শাড়ী আনতে। পরিয়ে দেখব আমার প্রেম সত্য কি না।

সুতপার মা আধুনিকা। এতে লজ্জা সে পেলে না! কিন্তু সুতপা দেখলাম লজ্জা পেলে। রাঙা হয়ে উঠল ওর গোলাপী গাল দুটো।

ঠিক এই সময়েই ফিরে এসেছিল সৌরীন। সে সমস্ত শুনে খুব

খুসী হয়ে বলেছিল, তা হলে ঠিক হয়েছে···বাবু আজ আর আপনার যাওয়া হবে না। সন্ধ্যেতে এখানে ছোট্ট একটি আসব হবে, তাতে আপনিই বলতে গেলে প্রধান, এবং একমাত্র অতিথি হবেন। তবে আপনি আর কাউকে বলতে চান অবশ্যই বলতে পারেন। আসরে সুতপা নাচবে। ওই লাল বেনারসী পরে।

কথাটা অবশ্যই আমি রাখি নি। চলে এসেছিলাম পূর্ব বন্দোবস্ত মত! কিন্তু ওই দুপুর থেকে সন্ধ্যের মধ্যেই সুতপা তার নৃত্যবিদ্যার সকল কলা প্রকাশ করে আমাকে দেখিয়ে তবে নিরস্ত হয়েছিল। কলা-কৌশল ছন্দ-গতির উপর ওব কতটা পারঙ্গমতা তার সঠিক বিচাবক আমি নই। তবে এটা ঠিক যে, ওই সবগুলিতেই সে নিজেকে আশ্চর্যভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছিল। এবং যা সেজেছিল তাতেই ওকে অপরূপা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ও সৌবীনের কন্যা বিংশ শতাব্দীর সুতপা না হয়ে এইটি হলেই ভাল হত। আর তেমনি তার নিজের সাজবার জ্ঞান ছিল সেই বয়সে। মিলনে বিরহে প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায় সে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ওব চোখে মুখে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তা আশ্চয মনে হয়েছিল আমার। মিলন বিরহ এগুলির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করে এর এমন প্রকাশ কি করে সুতপা করেছিল তা বোধ করি সকলকেই বিস্মিত করত।

সবশেষে ও পোষাক-টোষাক ছেড়ে সেই অতি আধুনিক ফ্রক পরে মাথার চুলগুলিকে যথাযথ বিন্যস্ত ক'রে মায় মোজা সমেত ষ্ট্র্যাপ দেওয়া জুতো পায়ে হেসে দাঁড়িয়েছিল কাছে। দেখলাম মুখের প্রসাধনেও বদল করতে ভোলে নি। অলকা-তিলকা থেকে সব মুছে মুখে পাউডারের পাফ দিয়ে এসেছে।

সৌরীনের সঙ্গেই কথা বলছিলাম। বলছিলাম নয়, সৌরীন উৎসাহভরে বলে যাচ্ছিল—আমি শুনছিলাম।

সৌরীন বলছিল ওই মেয়ের কথাই। বলছিল, এটা কি আপনি প্রতিভা বলে মনে করেন না? অন্ততঃ ট্যালেণ্ট। তাই বলাই ভাল।

ট্যালেণ্ট বললে আশ্চর্য ট্যালেণ্ট বলতে দ্বিধা করব না। ওর মা নাচ জানত, গাইতও ভাল। এখনও গায়। মন্দ গায় না। তবে এখন লজ্জা করে। সুতপা ওর কাছ থেকে পেয়েছে এই গুণটা। মন আমার পেয়েছে। নট এ্যাট অল শাই। খুব ফ্রি। খুব মডার্ণ। ছেলেবেলা থেকেই নাচে, ছেলেবেলায় সব মেয়েই নাচে, কিন্তু ওর নাচে ছন্দ এবং গতি এগুলো নিখুঁত ছিল। একদিন গ্রামোফোন বাজনার রেকর্ড বাজছিল, ও নাচছিল এ ঘরে। হঠাৎ ওর মা এঘরে ও কি করছে দেখতে এসে ওর নাচ দেখে ফিরে গিয়ে আমাকে ডেকে বললে—দেখ! মজা দেখ! সুতপা নাচচে, কিন্তু তালে মানে একটুও খুঁত নেই। আশ্চর্য। আমিও দেখলাম এবং দেখলাম—তাই বটে। স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয়ের একটুও অতিরঞ্জন নেই। বললাম—শেখাও ওকে। ও শেখাতে সুরু করল। এখানে একটা ছোটখাট মিউজিক কম্পিটিশন হয়, সেখানে প্রথম বছরেই ছোট মেয়েদের নাচে ফার্ষ্ট হয়ে গেল। ওর উৎসাহ খুব বেড়ে গেল। আমি নিরুৎসাহিত করিনি—উৎসাহ দিয়েছি। ওর মা মাঝে মাঝে বরং বলে, বেশী হয়ে যাচ্ছে। আমি বলি, না। মানুষের ট্যালেণ্ট সব নয়, এমন কি যদি সাধারণ প্রতিভা হয় তাও সব নয় ওর সঙ্গে বীজের উপর জল পড়া চাই নিয়মিত, ফার্টিলাইজার দেওয়া চাই। নইলে ওই কিছুটা হয়, তারপর আর হয় না। আমি ভুক্তভোগী যে! আমি ওকে ফুল স্কোপ দেব। গ্রামোফোন রেকর্ড কিনে দিই নিয়মিত। একজন ব্রজবাসী আছেন মানে মণিপুরী ডান্সার—তিনি সপ্তাহে তুদিন আসেন। ড্রেস করিয়ে দিয়েছি! ওর মা বলে শান্তিনিকেতনে দিতে। আমি তার ঘোরতর বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ নেই, বাংলা সাহিত্যই অনুর্বর হয়ে গেল। আপনারা ক'জন গ্রামজীবন গ্রাম্য চিত্র নিয়ে ভ্যারাইটি এনেছেন কিন্তু তার দাম কি? আমাদের নেমন্তন্ন খাওয়ার আসরে—পাঁপর দিয়েও বৈচিত্র্য আনি। সেই তিক্ত কষায় লবণ অম্লের পর হিং-এর গন্ধ-ওলা পাঁপর লাগে খুব ভাল—মুচমুচও করে। কিন্তু তার দামটা কি?

তবুও ওই পেঁপের-চাটনির দামও আছে এখানে। কিন্তু ওখানে রবীন্দ্রনাথের পর কি আছে বলুন? হ্যাঁ ছবি আঁকলে- নন্দলাল আছেন—সেখানে নিশ্চয় দিতাম।

তারপর হঠাৎ বললে—কিছু মনে করলেন না তো?

—কি মনে করব?

—এই পাঁপর-চাটনির সঙ্গে আপনাদের কালের সাহিত্যের তুলনা করলাম। হেসে বললাম--কেন মনে করব? তোমার মত বলেছ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—এক সময় ভাবি ভারী অন্যায় করেছি। সংসারের দায়ে চাকরি নিলাম, লিখলাম না।

চুপ করে রইলাম। বুঝলাম—আবার বদলেছে সৌরীন, জীবনে চাকরিতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। অথবা সেই পুরানো সৌরীন যাকে সে মাটি চাপা দিয়েছিল ঘা খেয়ে, সে আবার কবর ঠেলে উঠেছে। আশ্রয় করেছে মেয়েকে। যে সাধ তার নিজের জীবনে পূর্ণ হয় নি, তা সে পূর্ণ করতে চায় মেয়েকে দিয়ে।

আমি তবু বললাম, বেশ তো, বেটার লেট দ্যান নেভার। এখন আবার সুরু কর না।

সৌরীন বললে—নাঃ। ও আর হয় না। এখন আমার একটা ঝোঁক আছে। এখানে প্রোমোশন পেয়ে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে উঠেছি। কোনরকমে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে যেতে চাই। মানে পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে চাই। জানেন ওতে সুতপার খুব উৎসাহ। খুব!

ওদিকে কথায় কথায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল—ট্রেন আটটায়; সুতপার মা তাগিদ দিলে—সাতটা বেজে গেল। ওঁর পুজো আছে। উঠলাম। মুখ-হাত ধুয়ে পুজোয় বসেছি, এমন সময় সুতপা আবার ফ্রক ছেড়ে সেই লাল বেনারসী পরে এসে দাঁড়াল। পুজোর মধ্যেও একটু হাসি এল। পুজো শেষ করে বললাম, তোমার নাম সুতপা হওয়া উচিৎ ছিল না। তুমি তপস্যা ভাঙাতে জন্মেছ। পুজো করতে করতে তোমায় দেখে হেসে ফেললাম। মনে হল কোন

মোহিনী এসে দাঁড়াল। তোমার নাম ভাই মোহিনী—

সে বললে, না, অত্যন্ত বিশ্রী। দাদু—

বললাম, তাহ'লে নাম দিচ্ছি সুতপার বদলে সুরূপা। যদি বল, তবে অপরূপা বা বহুরূপাও রাখতে রাজী আছি।

সে দীপ্ত হয়ে উঠল। বললে, সুরূপা—সুরূপা নামটা আমি নেব দাদু। সুতপা—আমার ভাল লাগে না। তপস্যা আবার কি? না-খেয়ে, না-দেয়ে,না-হেসে, না-নেচে, পোষাক-পরিচ্ছদ না পরে, গাছের বাকল পরে। কেন?

বললাম—বরের জন্যে।

আবার সে বললে—না-দাদু, বাবা মিছে বলেন না। বলেন আপনার কথায়—উনি রাষ্টিক!

সৌরীন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি ওঘরে চলে গেল—খাবার দেওয়া হয়েছে কিনা দেখবার অছিলায়।

সুতপা বললে—আমি তো বিয়েই করব না।

তারপর আবার বললে—এই নামটা কিন্তু আমার ভারী পছন্দ হয়েছে দাদু, সুরূপা!

সুরূপা পাটনা ষ্টেশনে আমাকে সী-অফ করতে এসেছিল ওই শাড়ী পরে। শাড়ীখানা সে ওইজন্যেই পরেছিল তখন মডার্ন ছাঁদে।

এই সুতপা। সুরূপা নাম ওর আমিই দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ভুলে যাবারই কথা। এরপর আর আমার সঙ্গে সুতপা কেন—সৌরীনের সঙ্গেই দেখা হয় নি। আমি পাটনায় গিয়েছি মাত্র এক আধবার। কিন্তু পাটনায় সৌরীন ছিল না।

সৌরীনের বাসনা অপূর্ণ থাকে নি। সে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে ঢুকেছিল এবং প্রথম গিয়েছিল বার্মায়—তারপর ওখান থেকে হংকঙে। ওই হংকঙেই সে মারা যায়। হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছিল সৌরীন। খবরটা পেয়েছিলাম অনেক পরে। যেবার চীন যাই, সেবার

চীন থেকে ফিরে হংকঙে যখন ট্রেন থেকে নামলাম তখন ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন নারানবাবু। যাবার সময় ভারতীয় হাইকমিশন অফিস হয়ে যাবার সময় পাই নি। বলেছিলাম ফিরবার সময় আপনার ওখানে যাব-খাব। নেমন্তন্ন নিয়ে রাখলাম।

ওখানেই খেতে বসে নারানবাবুর কাছে সৌরীনের মৃত্যুসংবাদ পেলাম। নারানবাবু বললেন—সৌরীন আপনার খুব নাম করত! আপনার কে যেন হতেন।

—কে?

সৌরীন চক্রবর্ত্তী! পাটনার!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। সে এখন কোথায়?

—সে তো নেই, সে মারা গেছে। এখানেই মারা গেছে—হার্ট ফেল করে।

—কতদিন?

—দু বছর আগে।

—তার স্ত্রী আর একটি কন্যা ছিল—

—দেশে গেছে। কি করবে? মেয়েটি খুব অ্যাকমপ্লিশড ছিল। এখানে আমাদের ফাংশন হলেই নাচত। বিউটিফুল মেয়ে। নামটিও ভাল। সুতপা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম।

নারানবাবু বলেছিলেন, সৌরীনের মৃত্যুর জন্যে দায়ী একরকম নিজেই। ড্রিংক করতে ধরেছিল—বেশী পরিমাণেই খেত। এবং ফাস্ট লাইফ লীড করত। দুঃখের কথা। একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—ডাইনিং টেবিলে মিসেস চক্রবর্তী, এমন কি সুতপাকেও অভ্যাস করিয়েছিল। আমি বলেছিলাম তাতে বলত, আমার ওসব সুপারষ্টিশন নেই। এরপর ইয়োরোপে যাব, সেখানে যদি স্ত্রী জুজুবুড়ি সেজে থাকে তবে চলবে কি করে?

সুতপার জন্যে বলত, ও যদি ফরেনারকে বিয়ে করে আমি খুসী হব। না-হলে ওর কেরিয়ার একটা তৈরী হোক। নাচের ট্রপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে পৃথিবীময়। ঘর-সংসারে কি আছে? ওতে কতটুকু পায় মানুষ? প্রেম-স্নেহ সব কথার কথা। আসলে দরিদ্রের ঘরে অভাবের জন্য কলহের তিক্ততা, দুঃখ। আর অভাব না-থাকলে—চিরন্তন মানব স্বভাব যা—দু-চার দিনের বা দু-দশ মাসের বা দু-চার বছরের তৃপ্তির পর অতৃপ্তির দুঃখ আসবেই।

রহস্য করে বলত, জানেন মদ্যপান করেও যখন পা স্টেডি থাকে তখনই বুঝতে হবে যে, হ্যাঁ, দুঃখ আনন্দে অনাহারে প্রচুর আহারের পর অনায়াসে সহজ পদক্ষেপে পথ চলতে পারবে।

বলে হা হা করে হাসত।

মারা গেল একেবারে অকস্মাৎ।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম। তারপর প্রশ্ন করবারও আর কিছু পাই নি। অনেকক্ষণ পর খুঁজে পেয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—স্ত্রী কন্যার জন্য রেখে-টেখে কিছু গেছে!

—তা গেছে। কিন্তু সে খুব বেশী কিছু নয়। শুনেছি পাটনায় একটা ছোটখাটো বাড়ি করেছিল ওখানকার চাকরিতে থাকতে। তারপর ফরেন সার্ভিসে এসে উপার্জন করেছে যেমন তেমনি খরচ করেছে দুহাতে। তবে হাজার কতক টাকা রেখে গেছে নিশ্চয়। সে তো দিল্লী থেকে পাবে এবং তার অনেক হিসেব-নিকেশ। সময়ও লাগে অনেক। এ-জির কবল এবং শম্বুক গতি।

কলকাতায় ফিরে এসেও কথাটা মনে ছিল। একখানা পত্র লিখেছিলাম পাটনায় ফণির এক সহচরকে। ফণিও তখন মারা গেছে। ফণির জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছিলাম। দুঃখ সৌরীনের জন্যও পেয়েছিলাম। কারণ অনেক কটু কথা বলেও সে আমার সঙ্গে জ্ঞাতিত্বে ও সম্পর্কের জন্য গৌরব অনুভব করত। সুতপাকেও মনে পড়েছিল। সুন্দর রূপসী

ম য়ে হবার কথা তার। তখন হিসেবমত বয়স তার চৌদ্দ-পনের। কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশ করছে। চিন্তা ঠিক হয়েছিল তাকে নিয়ে তা বলতে পারব না তবে একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম।

ফণির বন্ধু উত্তর দিয়েছিল, সৌরীনের স্ত্রী-কন্যা সম্ভবত দিল্লীতে রয়েছে। লোকে নানান কথা বলে—তার স্ত্রীর সম্পর্কে। কন্যাটিও বড় হয়েছে। আল্ট্রা মডার্ণ। এখানকার বাড়ি বিক্রী করে গেছে। শুনছি, ওদের ইচ্ছে—ওবা এদেশে থাকবে না, বিদেশ চলে যাবে।

তারপব আর কি করবার ছিল আমার? করবার যা ছিল তা প্রকৃতির নিয়মে হয়েছে। ওদের ভুলেই গিয়েছিলাম। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এতকাল পরে বলতে গেলে ষোল বছর পর—যক্ষ্মা হাসপাতালে—মৃত্যু আশঙ্কা কবে ফিল্ম এ্যাকট্রেস সুরূপা বললে, পাটনার সুতপাকে মনে আছে? সুতপা?—

মনে পড়ল বই কি। সুতপার সুরূপা নাম যে আমিই দিয়েছিলাম। ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

॥ ছয় ॥

সেই সুতপা। মিলছে বই কি! চেহারাতে ঠিক মেলাতে পারছিনে। দেখেছিলাম একটি বালিকাকে আর এ দেখছি—এক যুবতীকে। ক্ষয়রোগগ্রস্তা যুবতী। যৌবন তার রোগের শোষণে নিঃশেষিত নয়—শীর্ণ। তার আভাস রয়েছে। এবং সে এই অবশেষটুকুকেই অশেষ যত্নে যথাসাধ্য প্রস্ফুট রাখতে চেষ্টা করছে।

নিউমোথোরাক্স হয়েছে। বুকে ব্যাণ্ডেজ রয়েছে। তার উপর সর্বাঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢাকা। মুখে ক্লেশের চিহ্ন। শুকনো ফুলের মত জীবনের সজীবতা এবং যৌবনশ্রী ম্লান হয়ে রয়েছে। তবু এরই মধ্যে তাঁর সুকুমার লাবণ্য ও শ্রীর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ঠোঁটে লিপষ্টিক নেই। চুলের বিন্যাস নেই। কিন্তু ঠোঁট দুটির মধ্যে সুন্দর মুক্তোর পাঁতির মত সাজানো দাঁতগুলির সৌন্দর্য যায় নি। চুল অবিন্যস্ত এবং শ্যাম্পুর প্রসাধন অভাবে বেশী রুক্ষ্ম তবু প্রাচুর্য্য এবং কোমলতার পরিচয় রয়েছে। চুলগুলি প্রাচুর্য্যের জন্যে বেশী ফুলে উঠেছে, রুক্ষতার কারণে মুখ বিশীর্ণ হয়েছে—তাতেই যা বিসদৃশ দেখাচ্ছে, কিন্তু তার রূপকে করুণ করে তুলেছে। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম —তুমি একদিন সুরূপা নামের আড়ালে নিজে লুকিয়ে চোখে গগলস পরে সিনেমা স্টারের পরিচয় দিয়ে আমার কাছে গিছ্‌লে আমি চিনতে পারি নি। সৌরীনের মেয়ে তুমি—ফরেন সার্ভিসে তোমার বাপ চাকরি নিয়েছিল—তুমি সিনেমা ষ্টার হবে ভাবি নি। কিন্তু আজ যখন সুতপা এবং পাটনা বললে তখন নিশ্চয় তোমাকে চিনতে পারছি। হংকংয়ে নারানবাবুর কাছে শুনেছিলাম তোমার বাবার মৃত্যুর পর দেশে ফিরেছ। তারপর পাটনাতেও খবর করেছিলাম—ফণি লিখেছিল—তোমার মা, তুমি বাড়ি বিক্রী করে চলে গেছ। লিখেছিল, বোধ হয় সুতপাকে নিয়ে তার মা ফরেন সার্ভিসে চাকরির চেষ্টা করতে গেছেন দিল্লীতে।

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

নার্স, ডাক্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার বললে—কথা বলবেন না। আপনার পাগলের মত আগ্রহে ওঁকে ফোন করে আজ আনিয়েছি। আপনি ভেবেছিলেন, রিব কেটে অপারেশন, হয় তো বাঁচবেন না। চেতন হয়ে পাছে আবার উতলা হন তাই ওঁকে আনিয়েছি। উনি এসেছেন—আবার আসবেন। স্যার আপনি বলুন।

আমি ওর মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম। মনে মনে বিচলিতও হয়েছিলাম। ওদের অতীত স্মৃতি নিরঙ্কুশ প্রীতি ও মাধুর্য্যময় নয়, কাঁটা তাতে যথেষ্ট ছিল। তবুও সৌরীনের আত্মীয়তাবোধের আপনাবোধের স্মৃতি এবং এই সুতপার সে দিনের শাড়ী চাওয়ার স্মৃতি এই মুহূর্তটিতে অত্যন্ত মধুর মনে হল। মনে হল—আমারই সেদিন ভুল হয়েছিল হয়তো। একান্তভাবে আপনার জন মনে করেই সৌরীনও সমালোচনা করেছে আমার এবং সুতপাও দাদু বলেই শাড়ী চেয়েছে। না হলে ভদ্রতা বজায় রেখে সৌরীনও বলতে পারত আমি খুবই ভাল লিখি এবং সুতপাও শাড়ী নিশ্চয় চাইত না। না হলে আজ এই সময়ে সে এমন করে আমাকেই বা স্মরণ করবে কেন?

সুতপা বললে, একটা—

ডাক্তার বললে—না। আজ নয়, কাল সন্ধ্যেতে উনি আসবেন। নিশ্চয় আসবেন।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম—আসব, নিশ্চয় আসব।

সুতপা হেসে তিনটি আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে ভ্রূ-ভঙ্গিতে যে ইঙ্গিত করলে তা অন্য কেউ সঠিক বুঝবার আগেই আমি বুঝলাম। হেসে বললাম—আসব, আসব, আসব।

বাঙালীর মেয়ে ইংরিজী শিখে বিদেশ ঘুরে এলেও ওগুলো মনের মধ্য থেকে মুছে যায় না। একান্ত অন্তরঙ্গতার মধ্যে যেখানে শিক্ষা-সভ্যতার খোলস আপনি একের পর এক খুলে ফেলে সহজ সাদা-সাপ্টা মানুষটি হয়ে দাঁড়ায়—তখনই 'মাথা খাবেন' দিব্যি বেরিয়ে যাবে

মুখ থেকে এবং শপথ করার প্রয়োজন হলে তিন সত্যি করবার কথাই মনে হবে। তখন আর give me your word বা কথা দিন—শপথে মন উঠবে না।

এবার সে হাসলে। আমি তার কপালে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলাম—তারপর বললাম—কাল। এমনি সময়। কেমন?

সে ঘাড় নেড়ে জানালে—বেশ।

বিষণ্ণ মনেই বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ডাক্তার বললেন—চলুন এবার; খানিকটা আমাদের সব দেখুন। বিশেষ করে যারা বেশ ভাল আছে, অনেকটা বা পুরোটাই সেরে গেছে তারা তো বেশ একটি দঙ্গল বেঁধে রয়েছে। তারা শুনেছে আপনি এসেছেন। আপনার কিছু বই আপনি একবার দিয়েছিলেন—একবার ওদের সোস্যাল ফাংশনে এসেছিলেন—তখন আমি এখানে ছিলাম না। কিন্তু সে কথা এসে অবধি মধ্যে মধ্যে শুনি। ওরা ভোলে নি। সে সময়ের কয়েকজন ওখানেই একরকম থেকে গেছে। ওইটেই ওদের পৃথিবী, এইটেই ওদের সমাজ, সংসার—দিদি-ভাই মাসী-পিসী সম্পর্ক পাতিয়ে কোন রকমে হেসে-খেলে কাটায়। ওরা বলে রেখেছে আমাকে।

কথাটা অজানা নয়। এবং কারুরই অজানা নয়। সেরেও যারা যায়, হাসপাতালে পরীক্ষা করে যাদের রোগমুক্ত বলে ছেড়ে দেয়, তারা বাইরে গিয়ে আবার ওখানেই ছুটে পালিয়ে আসতে চায়। বাড়িতে ওদের ঠাঁই হয় না। তারা দূরে দূরে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে থাকে। ওদের অবস্থা হয় অস্পৃশ্যের মত। এক অপরাধ করে ধরা পড়ে যারা জেল খেটে দাগী হয় তারা আর এরা বলতে গেলে এমনি অবস্থার মধ্যে পড়ে বাড়ি থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে চায়। জেলখাটা দাগী আবার অপরাধ করে জেলে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়—এরা আবার অসুখ হয়েছে বলে ফিরে এখানে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

সেবারই এটা শুনে গিয়েছিলাম। মানুষের মনে যত মমতা—তত মৃত্যু ভয়। মা যে মা—সেও যে ছেলের যক্ষ্মা হয়েছে—তার কাছ

থেকে অন্য ছেলেকে বাঁচাতে তাকে এমন অস্পৃশ্যের মত করে তোলে যে রোগাক্রান্ত ছেলের সহ্য হয় না। সে তার থেকে মরে বাঁচতে চায়। এ আমি জানি। দেখেছি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল। ডাক্তার বাবুকে বললাম—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—বলুন?

—ধরুন কোন ছেলে কোন মেয়েকে ভালবাসে--কি কোন মেয়ে কোন ছেলেকে ভালবাসে—তাদের একজনের রোগ হল—ভাল হল—তখন কি হয়? তাদেরও কি এমনি হয়?

—আগে তো তাই-ই হতো। ভালবাসা মারাই যেত। এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। স্বামীর হলে কথাই নেই—সে ফিরে যায় নিজের ঘরে—স্ত্রীর তাকে না নিয়ে উপায় কি? অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর সংসারের কথা বলছি। অবস্থাপন্ন ঘরেও ছেলেরা বিবাহিত হলে ফিরে গিয়ে নিজের ভাগ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে সংসার বাঁধে। স্ত্রীর হলেই বিপদ। আজকাল দু-পাঁচটির সৌভাগ্য হয় ফিরে যাবার। বাকীর হয় না। তবে রোমান্সের মধ্যে যে সব ছেলেমেয়ে রোমান্স অর্ধ-সমাপ্ত রেখে এখানে আসে তাদের শতকরা পঁচাত্তর জন ফিরে গিয়ে সংসার পাতে।

কথাটায় মনে পড়ল, কিছুদিন আগে বিখ্যাত সাহিত্যিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন আমার ওখানে। কথাপ্রসঙ্গে আজকের ছেলেমেয়ের পূর্বরাগ ক'রে বিয়ের কথা উঠেছিল। একটি মেয়ে তার মা-বাপের কথা না শুনে তার ভালবাসার জনকে বিয়ে করেছে, তার থেকেই কথাটা উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন এসব হল পাশবিক আচার। দেহের আকর্ষণে এরা এমনই উন্মত্ত যে, মা-বাপ সমাজ সংসার ধর্ম এরা কিছুই মানে না। এরই নাম মডার্নিজম।

আমি তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারি নি। বলেছিলাম বড় নিষ্ঠুর কথা বললেন।

—কেন ?

—ভেবে দেখুন আমরা যখন বই লিখি সেখানে বড়লোকের মেয়ে গরীবের ছেলেকে ভালবেসেছে, বড়লোক মেয়ের বাপ মেয়েকে কিছুতেই গরীবের হাতে দেবেন না। এমন ক্ষেত্রে মেয়ে মা-বাপ, তার ধন-সম্পদ, সাহায্যের আশা ছেড়ে দিয়ে ওই গরীব ছেলেকে বিয়ে করে এই দেখাই। এটা যে দেখাই সেটা মানুষ চায় বলেই দেখাই। এইটেকেই আদর্শ মনে করি। সেটা কেবল একালের আদর্শই নয় —চিরকালের আদর্শ। এত বড় সতী আমাদের পুণ্যশ্লোকা সাবিত্রী —তিনি সত্যবানকে পছন্দ করে এসে বাপকে বললেন, ওই রাজ্যহারা বনবাসী অন্ধরাজার ছেলে সত্যবানকে আমি পতিত্বে বরণ করতে চাই। এবং মনে মনে করেছি। নারদ সেখানে ছিলেন, তিনি বললেন, সেকি ? তুমি করেছ কি ? সে স্বল্পায়ু, আজ থেকে মাত্র আর এক বৎসর তার পরমায়ু। তার পরেই সে মরবে। এ সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ কর সাবিত্রী। বাপ বললেন, মা বললেন, কিন্তু সাবিত্রী শুনলেন না। তাকেই বিয়ে করলেন। এটাও কি তাই নয়! তিনি বলেছিলেন, এরা সাবিত্রী নয়। মরা স্বামীকে এরা তপস্যাবলে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে না। চুপ ক'রে গিয়েছিলাম। আজ মনে হল—এই যক্ষ্মারোগ থেকে সেরে ওঠা প্রেমাস্পদকে বিয়ে ক'রে বিপদের সম্ভাবনা মাথায় করে এবং প্রাণপণ সেবায় যারা তাকে বাঁচিয়ে রাখে তারা তো সাবিত্রীর পুণ্য এবং মহিমা অর্জন করেছে। আজ সুতপার এই অবস্থা না দেখে যদি এমনি অবস্থা দেখতাম তবে বড় খুসী হতাম। সুতপা আলাদা। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র!

ভাবতে ভাবতে এসে পড়েছিলাম ওই সব রোগীদের মহলে। তারা একখানা চেয়ার মাঝখানে রেখে চারিপাশে ঘিরে বসেছিল।

কথাবার্তা আর কি ? কথাবার্তার মধ্যে—

—এই বইটার গল্পের কথা সত্যিই বাস্তব না কল্পনা ?

—এই চরিত্রটা এমন করলেন কেন ?

—ওই বইটা ভারী চমৎকার সুন্দর।

—আচ্ছা যক্ষ্মারোগী নিয়ে বই লেখেন না কেন?

ঝপ ক'রে আমার মনে পড়ে গেল গতবার যখন এদের মধ্যে এসেছিলাম তখনও এই অনুরোধ শুনেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল একটি মেয়ের কথা। জয়া মুখার্জী। বছর কয়েক আগে থেকেই সে আমাকে পত্র লিখছে। মেদিনীপুরে আরোগ্যোত্তর আশ্রম, আফটার কেয়ার কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলার পরম প্রিয় বাঙালী গভর্ণব স্বর্গত হরেন্দ্রকুমাব মুখোপাধ্যায় মশায়। এই এদের বেদনা তিনি যেমন হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন তা আর কেউ করলে না। করলে অনেক সমস্যার এদের সমাধান হ'ত। তিনি এদের জন্যে অঞ্জলি পেতে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন নি মোটা মোটা অঙ্কর চেক, তিনি ভিক্ষুকের মত ভিক্ষাঝুলি কাঁধে নিয়েছিলেন। তাঁকে বলতাম আমি রাজভিক্ষুক।

মেদিনীপুর আফটারকেয়ার কলোনী, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, তাঁর আরও কয়েকটি হাসপাতাল আফটাব কেয়ার কলোনীর অন্যতম। সেখানে থেকে জয়া মুখার্জী আমাকে পত্র লিখেছিল। বিশেষ শিক্ষিতা মেয়ে নয়। চিঠিতে হাতের লেখা বাঁকাচোরা এবং বর্ণাশুদ্ধিতেও অশুদ্ধ কিন্তু মনের আবেগটা সে স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেছিল। আমার কোন একখানি বই পড়ে সে আমাকে তার ভাললাগার কথা জানিয়েছিল এবং তারই সঙ্গে অনুরোধ করেছিল যে তাকে নিয়ে আমি বই লিখি।

চিঠির উত্তর আমি দিয়েছিলাম—এবং করুণা করে আর দুখানি বইও তাকে পাঠিয়েছিলাম। উত্তর কিছুদিন পর পেয়েছিলাম একখানা মলাট-ছেঁড়া একসারসাইজ বুকে ভর্তি করে লেখা তার জীবনকথা।

ওখানকার ডাক্তারকে চিঠি লিখে ওর কথা জেনেছিলাম। জানিয়েছিলাম যদি, কোন বিশেষ দামী ওষুধ লাগে যা হয়ত ওখানে

দেওয়া সম্ভব হয় না তার দাম আমি তাঁকে পাঠাতে প্রস্তুত আছি। সেটা যেন তিনি আমাকে লেখেন।

ডাক্তার লিখেছিলেন। কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। মনের মধ্যে ভাল না হওয়ার একটা বাসনা আছে মেয়েটির নিজের জীবনের বেদনার জন্য। আরও লিখেছিলেন, ওকে এর পর কলকাতায় একবার শেষ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে এবং সেখান থেকেই ওকে সমাজ-জীবনে সহজ মানুষের মত চলাফেরার অনুমতি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে।

তারপর সে অনেক চিঠি লিখেছে আমাকে। তার মধ্যে তার জীবন নিয়ে বই লেখার কথা লিখতে ভোলে নি।

আরও একজনের কথা মনে পড়ল, আমার আত্মীয়া ভবানীর কথা। এমন মিষ্ট স্বভাবের মেয়ে আমি দেখিনি। স্বামী ডাক্তার, আত্মীয় আমার সে-ই। তার স্ত্রী হিসাবেই আমার সঙ্গে আত্মীয়তা। বিয়ে হয়েছিল বারো-তের বছর বয়সে। একটি কন্যা হবার পর তার অসুখ ধরল। তখন তারা থাকত বর্মন স্ট্রীটের মোড়ে, তেতালার উপর। আনন্দবাজার, দেশ পত্রিকায় যাতায়াতের পথে ওদের ওখান হয়ে আসতাম। বছরখানেক পর হঠাৎ ওর জ্বর হল। সেই জ্বর আর ছাড়ল না। কিছুদিন যেতে-না-যেতে দেখলাম তার সুন্দর শান্ত দুটি চোখকে ঘিরে যেন একটি গোল কালো ছাপের ছায়া পড়েছে। ক্রমশ সে ছায়া গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে সেই সুন্দর মেয়েটিকে একটি ভয়াল রূপে ফুটিয়ে তুললে। ওর ডাক্তার স্বামী বললে—টি বি হয়েছে।

স্বামী তার করেছিল অনেক। প্রচুর করেছিল। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চাকরি নিয়ে যুদ্ধে গেল টাকারই জন্য। স্ত্রীকে রেখে গেল পুরীতে সমুদ্রের ধারে ছোট একটা বাড়ি কিনে।

যাবার দিন ভবানী আমাকে বলেছিল—চলছি।

বলেছিলাম—ভাল হয়ে ফিরে এস।

সে বলেছিল—আসব না।

—কে বললে ?

—আমি বলছি, আমি জানতে পেরেছি।

—মনের ভুল তোমার।

—না মনের ভুল নয়। তা ছাড়া যেতেই চাই জামাইবাবু।

ভবানীর স্বামী আমার সম্পর্কে শ্যালক।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন, যেতে চাইবে কেন ? যেতে চাইবার মত হয়েছেটা কি। তোমার স্বামী তো তোমাকে অবহেলা করেনি।

—না তা করেনি। তবে ভেবে দেখুন—ওই মেয়েটা—রয়েছে—ও রয়েছে—ওদের যদি কোন ক্ষতি হয় আমার থেকে ; তবে তখন আমার নিজের কাছে কি বলবার থাকবে বলুন তো!

এ কথার উত্তর দিতে পারিনি।

ভবানী বলেছিল—দেখুন—ও যুদ্ধে চাকরি নিয়েছে। ভাল হয়েছে আমার। মেয়েটাকে ভাসুর নিয়ে যাবেন। আমি ঝাড়া হাত-পা। এইবার এই ফাঁকে আস্তে আস্তে ওই সমুদ্রের ধারে চলে যাওয়াই ভাল নয় কি, ভাগ্যের কথা নয় কি ?

কথাগুলির সাধারণ মানের সীমানা পার হয়ে আরও একটা মানে যেন আমার কানে আমার মনে ধরা পড়েছিল। চুপ করেছিলাম

ভবানী শেষ কথা বলেছিল—একটা কথা বলব!

—বল।

—আমার হতভাগ্যের কথা নিয়ে একটা গল্প লিখবেন ?

—কি লিখব ? ধর—ভবানীকে আমি জিজ্ঞাসা করছি—তোমার কিছু থাকে তো বল! কোন ইচ্ছে কোন সাধ ?

ভবানী একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—লিখবেন। ভবানী বললে, সাধ বাঁচতে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়েছিল।

সেদিন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি আসতে আসতে এই সব কথাই মনে হয়েছিল। বাড়ি এসে জয়ার চিঠিগুলি খুঁজেছিলাম

—কিন্তু পাই নি। বেশ মনে পড়ছিল একটা বড় খামের মধ্যে স্বতন্ত্র করে জমা করে রেখেছি। এই কয়েক মাস আগে সে পর পর খান দুই চিঠি দিয়েছে। একখানা নীলরতন হাসপাতাল থেকে, একখানা একটা বাসার ঠিকানা থেকে। সে পত্র ভয়ানক পত্র। এবং সেই সময়টা আমার জীবনের গাঢ়তম দুঃসময়। আমার বড় জামাই দুরন্ত ক্যানসার রোগে মারা গেলেন। আমার কন্যা তার পুত্র-কন্যাদের বুকে ধরে মুখ ম্লান করে পড়ে আছে। উত্তর দেওয়া হয় নি। হয়তো একটু বিরক্ত হয়েছিলাম পত্র লিখে বিরক্ত করবার জন্য। সে সময় বাংলার এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ ডিরেক্টার আমার বই থেকে একখানি ছবি করে-ছিলেন। দেখানো হচ্ছিল, তাও দেখতে যাবার মত মানসিকতাও আমার ছিল না, আজও সে ছবি আমার দেখা হয়নি. কিন্তু, তাতেও আমার আক্ষেপ নেই। যারা বেদনা, শোক—বিশেষ ক'রে পরমপ্রিয়ের শোককে—তুলে রেখে বা সরিয়ে রেখে কর্মজগতে কর্তব্য ক'রে যান তাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়তো। কিন্তু আমি তা পারিনি ; এমন অভিপ্রায় হওয়া মাত্র—সেই প্রিয়ের মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে আমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, ভুলে যাচ্ছ আমাকে? এতই সামান্য ছিলাম আমি তোমার কাছে? আর তো কিছুই চাইব না। আমার চাওয়ার মধ্যে তো দু'ফোঁটা চোখের জল। তা' থেকেও বঞ্চিত করবে? তা হলে কি প্রয়োজন কাব্যের?

যাক এ সব কথা। কিন্তু খুঁজতে বসেও সেই কথা মনে হচ্ছে। মনের সেই অবস্থার মধ্যে কোথায় যে রেখেছি খামখানি তা খুঁজে পেলাম না।

পরদিনও পেলাম না। থাক, তাহলে জয়ার কথা থাক। সুতপাই আজ সামনে—সুতপার কথা বড় হোক।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আবার গেলাম সুতপার কাছে। সুতপা আজ সুস্থ অনেকটা। বালিশ হেলান দিয়ে বসে আছে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে।

আমি ঘরে ঢুকে বললাম—ত্রিসত্য পালন করেছি। এসেছি আমি।

আকাশের দিকে তাকিয়েই রইল সে। কিন্তু স্মিতহাস্যে মুখ ভরে উঠল তার।

বললাম—আকাশ দেখছ?

সে বললে—চিল উড়ছে। বেশ লাগছে।

—কেমন আছ বল?

আপনি বলুন।

—আমার তো ভাল লাগছে। ডাক্তারও বললেন ভাল আছ।

—কালকের থেকে ভাল আছি। এটা ঠিক।

একটু রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। উত্তরে আমি বললাম, না। ডাক্তার বললেন, সত্যিই ভাল আছ, দিন দিন এইবার সেরে উঠবে।

—একটু ভাল হয়ে উঠলে তো ইয়োরোপ চলে যাব আমি।

একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমাকে ডেকেছ; মানে কোন প্রয়োজনে, না এমনি? দেখতে?

কৌতুকময়ী হয়ে উঠল সুতপা। দুটোই বটে। বললে সে।

চুপ করে অপেক্ষা করে রইলাম। সে বললে—ধরুন যদি বলি—বলবার জন্যে ডেকেছিলাম যে শেষ কথাটি যাই বলে গো কানে কানে—তোমায় ভালবেসেছিলাম মনে মনে প্রাণে প্রাণে। তাহলে দেখার সাধটা অবশ্যই থাকবে!

হেসে উঠলাম। বললাম—আমি তাহলে বলব—"এবারে নয় এবারে নয়, ফিরে বারে—তোমার তরে আসব আমি বারেবারে। এই ভুবনে।"

সে বললে—ওটা আমার আটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়ে যান। আগেরটার তলায়।

আগের লাইন দুটো পাটনায় ওকে লিখে দিয়ে এসেছিলাম। সেই লাইন দুটো বলেই সে আমার সঙ্গে কৌতুক করেছিল। জবাবে

হঠাৎ মাথায় এসে গেল ওই লাইন দুটো বলে জবাব দিলাম।

বললাম, কেন, ওটা বিধাতার দরবারে খত বলে হাজির করবে ?

—না, গান দুটো সম্পূর্ণ করতে হবে আপনাকে। এবং আমার এই খাতা নিন—এতে আমি লিখে রেখেছি আমার জীবনের ঘটনা। সব লিখেছি। এ থেকে আপনি বই লিখুন। এবং তা থেকে—। না, সে এখন থাক।

একখানা খাতা তার বালিশের তলা থেকে সে বের করে দিলে।

॥ সাত ॥

আগষ্ট মাস; দিল্লীতে বর্ষা নেমেছে। গতকাল, পরশু, পরপর দুদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়ে গেছে। তার আগেও হয়েছে। আকাশ আজকে ঝক্ঝকে নীল। ধুলো-ঝড়ের পালা আর একশো ষোল থেকে বিশ ডিগ্রী গরমের পালা শেষ হয়েছে। বাতাসে জলের স্পর্শ লেগে আবহাওয়াটি হয়েছে চমৎকার। আরাম লাগছে।

বিনয়নগর কলোনীর ছোট ফ্ল্যাটে জানালা খুলে বিছানায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে আমার মনের রোমান্স লেগেছে আকাশে বাতাসে।

কদিন পর সুতপার দেওয়া খাতাখানা খুলে পড়েছিলাম।

মা বাড়ি নেই। সকালেই বেরিয়েছে; রৌশেনারা গার্ডেন ক্লাবে গেছে। সন্ধ্যাবেলায় নাচ আছে আমার।

আমার বুকটা ধ্বকধ্বক করে উঠছে মধ্যে মধ্যে। নাচব; নাচ কেমন হবে? সমস্ত লোকের মনে আমায় ক্রিমসন রেড শাড়ী থেকে যে-ছটা ইলেক্‌ট্রিক লাইটের প্রতিফলনে ছিটকে পড়বে সে-ছটায় সাবা হলের সব লোকের চোখে রঙ ছড়াবে তো? আমার নাচের তালে তালে ওদের মন দুলবে তো? টিকিট অনেক টাকার বিক্রি হয়েছে। মনে মনে হিসেব করে দেখেছি আমরা, প্রায় পাঁচশো টাকা পাব।

বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর পৃথিবী প্রায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমার বাবা এ দুনিয়ায় অন্তত এই দারিদ্র্য আর কুসংস্কার আচ্ছন্ন দেশে অন্তত পঞ্চাশ বছর ভবিষ্যতের মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদের সেই পঞ্চাশ বছর পরের কালে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাস করেছি সেই পঞ্চাশ বছর পরের কালের দেশে। এ দেশে সেটা যতটা বাস্তব হয়ে উঠুক বা না-উঠুক অন্যদেশে গিয়ে তা অনুভব করতে পারতাম। তাঁর মৃত্যুতে হঠাৎ পিছিয়ে এসে পড়লাম পঞ্চাশ বছর পিছনে।

পাটনায় ফিরে এসে কি অবস্থা যে হয়ে উঠেছিল—সে যখন মনে পড়ে তখন শিউরে উঠে ভাবি—উঃ—ওই কয়েকটা মাস কি ক'রে বেঁচেছিলাম। কিন্তু মা আমার বাবার শিক্ষার আর তাঁর যোগ্যতায় সে অবস্থাকে জঞ্জালের মত ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। লোকে বলেছিল, দুর্দশার এবং লাঞ্ছনার আর শেষ থাকবে না!

মায়ের নামে অপবাদ যে যেমন পেরেছে দিয়েছে। মা গ্রাহ্য করেন নি।

ইংরেজ আমলে বেহারে কংগ্রেস মিনিষ্ট্রিতে যে মিনিষ্টারের অধীনে বাবা তাঁর পি-এ ছিলেন তাঁকে পাকড়ে মা যাত্রা স্থুরু করেছিল। মা ভুল করেনি। মিনিষ্টার খুব সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন; মাকে একটা চাকরি আমাকে একটা চাকরি করে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই আর মিনিষ্টার ছিলেন না। চাকরির চেষ্টা করে কিন্তু করতে পারে নি। তবে মাকে স্বাধীন আমলের কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়েছিলেন এবং টাকাও কিছুখানি দিয়েছিলেন মাকে।

এই সময় এল রবীন্দ্র জন্মোৎসব।

মা বললেন—চল।

বললাম—কোথায়?

—উৎসব কমিটির কাছে। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ফাংশন তো হবেই, তাতে তোকে কিছু করতে হবে।

রবীন্দ্র জন্মোৎসবে চান্স পেলাম গর্দানীবাগের ফাংশনে। বাবার নাম পাটনায় সুপরিচিত। বাবার বন্ধুরা এখন হোমরা-চোমরা—তাঁরা সাহায্য করতে না করলেন না। অবশ্য সাহায্য না করলেও ক্ষতি হ'ত না। আমাকে কেউ চাকরি দিক বা না-দিক, কালচারাল ফাংশনে পার্ট দেবে না এ হতেই পারে না! সেবার শ্যামা হ'য়েছিল, আমি শ্যামা করেছিলাম। এবং রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলাম। তাই বা কেন—যেদিন প্রথম গেলাম কমিটির কাছে বলতে গেলে সেই দিন থেকে।

বাবার পরিচয়ে চিনতে কারুর দেরী হয় না। মাকেও অনেকে চিনতেন। আমি যুবতী। আমি ওদের কাছে বিস্মৃত পরিচয়ের কেউ হলেও ছেলেবেলার পরিচয় আমারও ছিল। আমি তো প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলাম তখন! মাকে ক'টি তরুণ এসে প্রণাম করেছিল। একজন বলেছিল, চিনতে পারছেন না খুড়ীমা আমি বুলবুল সেন। অমর সেন—ব্যারিষ্টার—

—ওমা! মা সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে হেসে বলেছিলেন, তুমি বুলবুল! তুমি কতবড় হয়েছ। এঁ্যা? একেবারে ভদ্রলোক বনে গেছ। তা তুমি ভাল আছ? কি করছ? তোমার বাবা মা এঁরা ভাল আছেন?

সে একগাদা প্রশ্ন।

বুলবুল সেন দেখতে 'স্মার্ট ইয়ংম্যান', পোষাক পরিচ্ছদের খুব বাহার। কিন্তু বোকা বোকা। আমার চোখে। বলতে গেলে এদেশের নব্বুইটা ছেলে যারা নিজেদের খুব আপটুডেট, প্রগতিশীল বলে সমাজে বলে তারা আমার চোখে কিন্তু বোকা বোকারই সামিল। বিশেষ করে বিদেশ ঘুরে আসার পর এইটুকু আমি হলপ ক'রে ব'লতে পারি। ওদের গায়ের উপর যে রঙটা সেটা এমন কাঁচা আর এমনি লাগাবার ধরন যে একটু আঁচড় পড়লেই সেটা চটে গিয়ে আসল রঙটা বেরিয়ে পড়ে।

বুলবুল সেন এতগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছিল। ওদিকে ওর পিছনে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা কথা বলবার সুযোগের জন্যে বুলবুলকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল।

একজন তো, বুলবুলের কথার মাঝখানে কয়েক সেকেণ্ডের ফাঁক পেয়ে বলে উঠল, আমি মণ্টু চ্যাটার্জী বউদি!

মা বললে, হ্যাঁগো হাঁ, তোমাকে আমি অনেকক্ষণ চিনেছি। কথা বলতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। বড়লোকের ছেলে মোটরে চড়ে বেড়াও। দেখলে গরীব বউদিকে তো চিনতেও পার না।

—না না বউদি, আমি ঠিক দেখামাত্র চিনেছি। আপনি বুলুকে জিজ্ঞাসা করুন —আমি ঘরে ঢুকেই বলেছি—আরে বুলু—মিসেস চক্রবর্তী আমাদের সৌরীন বউদি নয়?

—তাই নাকি? তবে বোধ হয় আমারই ভুল। এই পরশু আমি স্টেশনে গিছলাম, ফিরবার সময় একখানা গাড়ী আমার রিক্সার পাশ দিয়ে চলে গেল—যে ড্রাইভ করছিল তাকে ঠিক তোমার মত মনে হল। আমার দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। আমি তোমাকে ভেবে একটু হাসলাম—কিন্তু দেখলাম হুস্ করে চলে গেল গাড়ীখানা। নতুন ফিয়াট গাড়ী। ভাবলাম, মণ্টু আমাকে চিনতে পারলে না। এখন দেখছি আমারই ভুল।

মণ্টুর মুখখানা কেমন হয়ে গেল। বোকা মুখ—বেহদ্দ বোকা হয়ে গেল; চিরকুমার সভার পূর্ণ যেমন নির্মলাকে সেদিন কেমন বেলুন উড়েছিল দেখেছিলেন—বলবার সময় ইডিয়ট হয়ে যায় ঠিক তেমনি। তেমনি ভাবেই—ওই রসিকবাবু বলছিলেন—ফ্যাকাসে মুখে বলে উঠল—ও। —ও—। এ্যাঁ—হ্যাঁ। মানে সে তো আমিই বটে। পরশু তো আমি স্টেশনে গিছলাম বটে। ফিয়াট গাড়ীই বটে। একখানা রিক্সায়—হ্যাঁ, মানে—হ্যাঁ, দেখেছিলাম—। হ্যাঁ। কিন্তু। ঢোক গিলে মণ্টু বললে—মানে আমার মাথায় তখন এমন একটা প্রবলেম—মানে বিজনেসের চিন্তা, মানে—আমি বিজনেস করি তো—তা ঘুরছিল। বলে দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

মা কিন্তু তাকে আর অপ্রস্তুত করেন নি। বলেছিলেন—ও—তাই। হ্যাঁ—তা না হলে কি আমাকে চিনতে না পার।

—কিন্তু সেটা আমার অপরাধ হয়ে গেছে নিশ্চয়। কিছু যেন মনে করবেন না বউদি।

—না—না। তাই আবার করে নাকি। বেশতো তার প্রায়শ্চিত্ত করে আজই আমাদের বাড়ি পৌঁছে দাও গাড়ী করে। সুতপাকে চিনতে পারছ তো?

—নিশ্চয়! সুতপাকে দেখে তাই তো বলছিলাম—হাউ ওয়াণ্ডার-ফুলি শী হ্যাজ গ্রোন! এখনও নাচে সুতপা?

—নাচে মানে? হংকং, জাকার্তা, পাকিস্তানে ঢাকায় এই তিন জায়গায় উনি ছিলেন—তা আমাদের ওখানে যত ফাংশন হয়েছে ও তাতে নেচেছে। জান বালীতে ওখানকার ড্যান্স শিখে এসেছে! এখানে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কালচারাল ফাংশনে পার্ট করবে বলে এসেছে। তা শ্যামাতে ও শ্যামা করবে ঠিক হল।

মণ্টু কৃতার্থ হয়ে গেল। গাড়ীতেই বাড়ি ফিরলাম। মা বললে—মণ্টু তোমার এ পানিশমেণ্ট পর্যাপ্ত হল না।

গাড়ী চালাতে চালাতে মণ্টু বললে—কেন বউদি?

মা বললে—অন্ততঃ আমার মন তাই বলছে। এখানে থাকতে তুমি এই বউদির একটু হাসি-প্রসাদের জন্যে বোখারা সমরকন্দ দিয়ে দিতে পারতে। আব তুমি সেই বউদিকে চিনতে পার নি দেখে এটা কি কম অপরাধ?

মণ্টু এবার আর ফ্যাকাসে হয়ে গেল না। কারণ বুঝতে পেরেছে মায়ের কথার মধ্যে খোঁচা নেই। এবং গরজের সুরটা স্পষ্ট। সে বললে, বেশ তো বউদি, দিন দণ্ড।

মা বললে—তা যদি অধিকার দিচ্ছ তাহলে বলি এই রিহারশ্যালে আমাদের নিয়ে যাওয়া—নিয়ে আসাটার ভার তোমাকে নিতে হবে। ঠিক বিকেল ছটার পর আসবে। চা খাবে আমার ওখানে, আবার রিহারশ্যাল শেষে পৌছে দিয়ে এক কাপ কফি খেয়ে বাড়ি যাবে। সুতপা কফি খুব ভাল করে। আমার থেকে অনেক ভাল। চল, আজই তোমাকে খাইয়ে পরীক্ষা দিয়ে দেবে। মণ্টু চ্যাটার্জী বিগলিত হয়ে গেল। গাড়ীর ড্রাইভিং সিটের সামনে যে আয়নাটা থাকে সেটাতে মণ্টুর মুখ দেখবার চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম না। রাত্রিকাল, গাড়ীর ভিতরটায় অন্ধকার হয়ে রয়েছে। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে—ওর চিত্তের বিগলন যেন আমি উনোনের উপর তপ্ত কড়াইয়ে দালদা গলার

মত দেখতে পাচ্ছিলাম।

মার মুখের দিকে তাকালাম। মণ্টু নিজে ড্রাইভ করছিল, আমরা মা-মেয়েতে পিছনে বসেছিলাম। মায়ের পাশে বসে মায়ের মুখ অন্ধকার হলেও বেশ নজর হচ্ছিল। মা মুখ টিপে টিপে হাসছে আর কথা বলছে।

মা আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়। এখন বয়স আটত্রিশ পার হচ্ছে। কিন্তু দেখতে মাকে আরও কম বয়সের মনে হয়। মণ্টু চ্যাটার্জী বাবার আমলে প্রায় আসত। বাবার খুব ভক্ত ছিল। বাবার থেকে বছর দশেকের ছোট। মার থেকে বছর চারেকের। লোকে বলত, মধ্যে মধ্যে বাবাও মাকে ঠাট্টা করে বলতেন—মণ্টুর ভক্তি কিন্তু আমার থেকেও তোমার ওপর বেশী।

মা হেসে বলত—সে তোমার ওই কুকুরটাও আমার অনুগত বেশী। হিংসের কারণ নেই। ওকে আমি খাটিয়ে নি। এটা এনে দেয়—ওটা এনে দেয়। এ বরাতটা শোনে—

বাবা হাসতেন।

হঠাৎ আমার মনে হল—মায়ের আমার বিয়ের বয়স আজও আছে। খুব কৌতুক বোধ করলাম আমি।

সেদিন কফি খেয়ে মণ্টু চ্যাটার্জী যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে তাতে আমি যে আমি নানান দেশঘোরা মেয়ে—সে পর্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কথার উত্তর পর্য্যন্ত জোগাল না।

মণ্টু চ্যাটার্জী চলে গেলে মা খুব হাসতে লাগল। বললে, ওটা একটা নাম্বার ওয়ান ইডিয়ট। উল্লুক একটা।

তারপরই গম্ভীর হয়ে বললে—কিন্তু খুব সাবধান সুতপা, এরা হল ডেঞ্জারাস টাইপ অফ ইয়ংমেন। ওদের একটা দল আছে—সে দলের এই ইডিয়টটাই পাণ্ডা। এদের কাজ হল যে সব বাড়িতে মেয়েরা মডার্ণ আর আইবুড়ো হয়ে আছে তাদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা জমায়। মেয়েদের মাকে বলে মাসীমা। খুড়ীমা। প্রেজেণ্ট নিয়ে যায়। খুব

কালচারের কথা বলে। আর হৈ হৈ করে। সব বড়লোকের ছেলে—লেখাপড়াও মোটামুটি জানে। মেয়েদের মায়েরাও ভাবে টোপে গেঁথে ফেললে—মেয়ের হিল্লে হয়ে যাবে। তারাও প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু ওদের মতলব অন্যরকম। শুনলাম একটি গরীব টীচারের মেয়ে ওদের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের টেবিলে মরেছে। কলকাতায় ব্যাপারটা ঘটেছিল—বাপকে হাজার তুয়েক টাকা দিয়ে চাপা দিয়েছে।

পড়তে গিয়ে কেমন যেন শরীর মন তুইই অসুস্থ হয়ে পড়ল। এ কি পড়ব? এ নিয়ে কি লিখব? বিশ্বজগতে এতকাল ভগবানের দোহাই পেড়ে মানুষ পশুত্ব মোচনের একটা নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করে এসেছে—আজ ভগবানকে নিয়ে অনেক তর্ক। আছে কি নেই এ নিয়ে কলহ কোলাহলের শেষ নেই। ভারী হয়ে উঠেছে সেই দলটাই যে দল বলছে নেই। ভগবান থাক বা না থাক মানুষ তো আছে। তারা তো ভগবান নেই বলে মনুষ্যত্ব নেই এ কথা বলে না। ভগবান নেই যারা বলে, তাদের মধ্যে বড় বড় মানুষ, বিরাট মনুষ্যত্বের তো অভাব নেই। নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে সব বিতর্ক বাদ দিয়ে যেখানে ঐ সম্পর্কের মধ্যে বেচা-কেনার লেন-দেনের সম্পর্ক আসে, হৃদয়ের সব সংস্পর্শ বাদ দিয়ে দেহ সম্পর্কটাই এক এবং অদ্বিতীয় হয়ে ওঠে সেখানে ভগবানের কথা সমাজের কথা চুলোয় যাক—মনুষ্যত্বও যে সেই চুলোতেই পুড়ে খাক হয়ে যায়। আদিকাল থেকে সব দেশে এই পাপ রয়েছে কিন্তু তাতে মানুষ লজ্জা পাক বা না পাক মনুষ্যত্ব লজ্জা পায়। তাই এই ধরনের কথা নিয়ে কথা সাহিত্য মানুষ গোপনে পড়ে। সুতরাং এ পড়ে কি করব?

ভাবলাম কাল বা পরশু সুতপাকে খাতাখানা ডাকে ফেরত পাঠিয়ে বলব, সুতপা তোমার জীবন-কথা তুমি লিখো, এ নিয়ে লেখার মত শক্তি আমার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল জয়ার কথা।

সেই এক মেয়ে—। আশ্চর্য! সুতপার ঠিক বিপরীত।

আমি খুঁজতে লাগলাম তার পাঠানো খাতা আর চিঠিগুলো কোথায়। সে খাতাখানা এমন সুন্দর খাতা নয়। একটা অতি সস্তা একসারসাইজ বুকে লেখা। এমন সুন্দর হস্তাক্ষরও নয়, কথার এমন গাঁথুনিও নেই। অনেক বানান ভুল আছে কিন্তু সে আশ্চর্য। কিছুটা শুচিবায়ুগ্রস্ত বটে কিন্তু বিচিত্র এবং বিস্ময়কর।

॥ আট ॥

জয়ার খাতাগুলো খুঁজে বের করবার একটা তাগিদ অনুভব করলাম। করলাম সুতপার কাহিনীর ওই পর্যন্ত প'ড়ে। সুতপা এর পর খ্যাতি অর্জন করেছে—করেছে পাটনার ওই মণ্টু সেনদেরই সাহায্যে। এ এক দড়ি টানাটানির খেলা। এ খেলা সংসারে চিরকাল আছে! চিরকাল থাকবে। থাকবে কেন—ওই খেলাটাই সব থেকে বড় হয়ে দাঁড়াবে তাতে সন্দেহ নেই। এবং আমার মত সেকালের মানুষ এ খেলাকে পছন্দ করুক বা না করুক তাতে এ কালের কিছু আসে যায় না। আমার মত সে কালকে বিগত ক'রে সে আসবে এবং মানুষকে ভাসিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলবে।

এ সংসারে ধ্যান ধারণা, ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দের নিরিখ নিত্য পাল্টায়, হয় তো প্রতিক্ষণে পাল্টায়। পাল্টাতে পাল্টাতে এমন একটা সময় আসে যখন অকস্মাৎ একদিন শিউরে উঠি, সামনেই যে সংসার দেখি সে সংসারটা সম্পূর্ণ বদলানো সংসার।

জয়ার খাতা তার চিঠি সব আমি সঞ্চয় ক'রে রেখেছি। কোথায় রেখেছি ঠাহর নেই। খুঁজতে খুঁজতে বের করলাম।

ছোট একসারসাইজ বুকের খাতা ছিঁড়ে লিখেছে এগার পৃষ্ঠা। গোড়ার পাতাতেই লিখেছে"শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক চন্দ্রশেখরের করকমলে আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটি অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিলাম। ইতি। জনৈকা যক্ষ্মারোগিনী জয়া।"

পাতা ওল্টালাম। জয়ার লেখা সুতপার লেখার পাশেই রাখলাম। বানান ভুলে ভরা টেরা বেঁকা অক্ষরে লেখা।

(১)

জয়া লিখেছে আমার বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গ। আমার বাবা কাকারা দরিদ্র (দরীদ্র লিখেছে জয়া) স্কুল মাষ্টার হলেও আমাদের সংসারে দারিদ্র্য কখনও ছিল না। কারণ আমার বাবার ঠাকুরদাদা ছিলেন

জমিদার ; জমিদারির অবশিষ্ট কিছু কিছু ছিল। বিজয়া দশমীর দিন জন্ম বলে আমার নাম জয়া।

লোকের মুখে শুনি—আমি খুব আদুরে ছিলাম ছোটবেলায়। বাবা কাকার সংসারে আমি প্রথম সন্তান।

পার্টিশনের পর আমরা দেশ ছেড়ে নদীয়া জেলায় পশ্চিমবঙ্গে চলে আসি। নতুন বাড়ি ও দোকান করে বাবা নতুন জীবন আরম্ভ করবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু হঠাৎ তাঁর হল টি বি। মা একা সংসারে ছোট ভাইকে নিয়ে সংসার চালিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারতেন না বলে আমাকেই করতে হ'ত বাবার সেবা যত্ন।

বাবা মারা গেলেন চিকিৎসার অভাবে। চিকিৎসা হয় নি পথ্য জোটে নি। বাবার মৃত্যুর কুড়িদিন পর মাও মারা গেলেন। বোধ হয় মায়েরও টি বি হয়েছিল। কিন্তু মা সে প্রকাশ করেন নি। মায়ের মৃত্যুর আগের রাতের দৃশ্য আজও ভুলতে পারি নি। দেড় বছরের ভাই ঘুমিয়ে আছে মায়ের পাশে। আমি ন বছরের মেয়ে, সারারাত মায়ের মাথার কাছে বসে আছি। তিনি জড়িত (জয়া লিখছে জরিত) স্বরে কত কথা বলেছিলেন কিন্তু আমি তার কিছু বুঝিনি। মায়ের মৃত্যুর দিন বাড়ি ভর্তি প্রতিবেশী। একজন ডাক্তারও এসেছিলেন শেষ কালে। সবার চোখে জল দেখেছিলাম। বাবার চেয়ে মাকে বেশী ভালবাসতাম। তবুও মায়ের মৃত্যুতে আমি কাঁদিনি।

মায়ের মৃত্যুতে পাষাণ হয়ে গিয়েছিলাম কি না জানিনা। তবে মনে পড়ছে আমার সব চেয়ে বড় চিন্তা হয়েছিল আমি রাত্রে ঘুমাবো কার কাছে ? মাকে ছাড়া কিছুতেই আমার ঘুম হত না। সেই থেকে আমি একলা শুই। কারুর কাছে শুলেই মনে পড়ে যায় মায়ের কথা, তখন আর ঘুম আসে না।

বাবার মুখাগ্নি করেছিলেন মা।

মার মুখাগ্নি করেছিলাম আমি। আমার ছোট ভাই আমার কোলেই ছিল সে সময়। দেড় বছরের ভাই।

ছোটবেলা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মরা মানুষকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে কি করে? তিনি বলতেন বড় হলে বুঝতে পারবে।

ন বছর বয়সেই বোধ হয় বড় হয়েছিলাম। ন' বছর বয়সে মা'র মৃত্যুর পরেই দেখলাম সে-দৃশ্য।

মায়ের মৃত্যুর পর যে ক'দিন ওই বাড়িতে ছিলাম সে কয়দিনই সুযোগ পেলেই ভাইকে নিয়ে চ'লে যেতাম শ্মশানে।

তারপর স্থানান্তরিত হ'তে হল। কোথায় থাকব সেখানে? কার কাছে? আমার পাঁচ মামা, তাঁরা বিরাট বড় লোক, কিন্তু তাঁরা কিছুতেই রাজী হন নি আমাদের ভাই বোনের দায়িত্ব নিতে।

বলতে পারব না কেন? তবে নেন নি। অথচ এককালে খুব আত্মীয়তা দেখাতেন তাঁরা।

কাকা ফেলতে পারেন নি। কাকা কলকাতায় থাকতেন। প্রথম তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে আমাদের রাখলেন ওইখানেই—টাকা দিয়ে। কিন্তু তাঁরা করতেন ঠিক ঠিকে ঝিয়েব মত ব্যবহার। আমাদের সেই দুরবস্থা দেখে কাকা আমাদের কলকাতায় নিয়ে এলেন। সংসারের সমস্ত কাজ আমিই করতাম। দেড় বছরের ভাইকে নিয়ে আমারই ছিল সব চেয়ে কষ্ট। সে ছিল রুগ্ন। তার সব আবদার আমাকে সহ্য করতে হ'ত। কাকাকে পেয়ে বাবার অভাব ভুলে-ছিলাম। মায়ের অভাব ভোলা যায় না। কাকা আমাদের মানুষ করবার জন্য পিতৃমাতৃহীনা এক গরীরের মেয়ে বিয়ে করলেন,সেই কাল হল। কাকীমা গরীবের মেয়ে হয়েও পিতৃমাতৃহীনা হয়েও আমাদের ভাই বোনের দুঃখ বুঝলেন না। তাঁর কাছে পেয়েছি শুধু লাঞ্ছনা। এই কষ্টের মধ্যে এগার বছর বয়সে আমি হলাম পাগল। পাগল হয়ে আমার একমাত্র কথা ছিল চিৎকার ক'রে বেড়াতাম 'ভারতমাতা! তুমি সত্যই সন্তানদের মত ভালোবাসো তবে যেন কারুর মা বাবা মারা না যায়।'

কাকা, ভাল পাগলের চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করানোতে কিছুদিনের মধ্যে সেরে যাই।

এরপর কাকীমার পালা।

আমার পাগল ব্যাধি সারল, কাকীমাকে ধরল। কাকীমা পাগল হয়ে গেলেন। কাকা তাঁরও চিকিৎসা করলেন। ছ মাস। ছ মাস পর কাকীমা সারলেন। এই ছ মাসের মধ্যে কাকার একমাত্র বাচ্চা মেয়ে মায়ের দুধ মায়ের যত্ন না পেয়ে মারা গেল। এবার কাকা হ'লেন পাগল, কাকীমা ভাল হয়ে পাগল স্বামীকে ফেলে চলে গেল দূর সম্পর্কের ভাইয়ের কাছে। কলকাতা সহরে পাগল কাকা আর সাড়ে তিন বছরের অবুঝ রুগ্ন ভাইকে নিয়ে, শুধু আমি রইলাম সুস্থ প্রকৃতিস্থ। উন্মাদ কাকা আর রুগ্ন ভাইকে নিয়ে যে সে আমার কি বিপদ!

একদিন ধৈর্য্যহীন হয়ে গিয়েছিলাম ট্রামের তলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা দিতে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বড় ভয় লাগল। পারলাম না, ছুটে পালিয়ে এলাম।

এর মধ্যে সব কিছু দুঃখ কষ্ট উপেক্ষা করে লেখা পড়ার জন্যে চেষ্টা করেছি। কাকার একান্ত ইচ্ছা ছিল আমাদের ভাই-বোনকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলে দায়িত্ব শেষ করবেন। কিন্তু তা হল না।

এর মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছিলাম আমি। তার পর সব বন্ধ হয়েছিল। কাকা ভাল হয়ে ওঠেন নি। তিনি কোথায় চলে গেলেন একদিন।

আমরা ভাই বোন দুজনে দুজনের হাত ধরে পথে বের হলাম। আমার বয়স তের, ভাইয়ের ছয়। কোথায় যাব?

পথে পথে ঘুরে ঠাঁই আমি জোগাড় করেছিলাম।

দুটো পয়সা দাও বলে হাত পেতে ভিক্ষে করতে পারি নি।

ঠাঁই জোগাড় করেছিলাম অনাথ আশ্রমে।

আশ্রমের নাম জাহ্নবী-শিল্পাশ্রম। শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ প্রভৃতির দিক দিয়ে জাহ্নবী অনাথ আশ্রমের খুব নাম, খুব ডাক, অনেক প্রশংসা। কিন্তু ভিতরের রূপ সে চোখে দেখেও দেখা যায় না, সে

অনুভব করে বুঝতে হয়। সে অনুভূতি তারই হয় যে বা যারা ওখানকার ভুক্তভোগী। তারা ওই যারা অনাথ আশ্রমে যায়, বাস করে—অন্যেরা নয়।

কিছুদিনের মধ্যে প্রাণ হাহাকার করে উঠল।

সেখানে, স্নেহ ভালবাসা মায়া দয়া শিক্ষা আদর্শ কর্তব্য কোনটাই নেই। আছে শুধু নিষ্ঠুর শাসন আর অনাথ পিতৃ-মাতৃহীনদের শোষণ করে কাজ আদায়ের ব্যবস্থা। আধপেটা খাইয়ে ছেলেমেয়েদের অমানুষিক (জয়া লিখছে 'অমানুষিক') পরিশ্রম করায়। যদি কেউ অবাধ্য হয়—তবে তার শাস্তি অতি মর্মান্তিক। প্রতিদিন রাত্রে নিয়মিত ছেলে মেয়েদের ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। রাত্রে বাথ-রুমে যাবার নিয়ম নেই, উপায় নেই, জল তৃষ্ণা পেলে জল নেই। সে কি ভীষণ কষ্ট অন্যে বুঝবে না। ঘরে যখন তালা পড়ে তখন মনে হয় পরের দিন সকাল আর আসবে না। এইটেই শেষ রাত্রি।

ছেলেমেয়েরাও কিন্তু হার মানে না। তারা ভীষণ দুর্দান্ত, সুযোগ পেলেই পালিয়ে যায়। দেওয়াল ডিঙোয়। পথে ভিক্ষে করে গাছতলায় শুয়ে থাকে কিন্তু এখানে আর ফেরে না।

আমি পালাতে পারিনি,চেষ্টাও করিনি। আমার ভাইটি যে ছোট।

সব থেকে মর্মান্তিক কি হয়েছিল জানেন ?

আশ্রমের দেড় শো ছেলেমেয়ে সকলেরই পরিচয় ছিল জারজ সন্তান। আমরে মাকে মনে পড়ত বাবাকে মনে পড়ত। নিজের বেঁচে থাকার ওপর ঘেন্না হত। শুধু আমি নই—আশ্রমের দেড় শো ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছেলেমেয়েরই—এই পিতৃমাতৃ পরিচয় ছিল—সুস্থ পরিচয় যে পরিচয়ে লজ্জা নেই সেই পরিচয় তবু অনাথ বলে ওই জারজ পরিচয়ই মাথায় করে নিতে হয়।

সংসারে মা বাপ মরে যে কেউ অনাথ হয় এ আশ্রমের কর্তারাই শুধু নয়—বাইরের যারা দেখতে আসতেন, আসেন—তারাও কেউ বিশ্বাস করেন না। সেখানকার শিক্ষয়িত্রীদের মা বলে ডাকতে হয় ;

কত প্রত্যাশা করেই তাই ডেকেছি—মায়ের মতই শ্রদ্ধা করেছি—ব্যগ্র হয়ে খুঁজেছি—মায়ের স্নেহ ভালবাসা কিন্তু ক্ষণেকের তরেও পাই নি।

এরই মধ্যে নিত্যকারের সূর্যোদয় সূর্যাস্তের মধ্যে দিন রাত্রি পার হয়ে গেল—আমার বয়স বাড়ল। তখন পনেরোতে পা দিয়েছি।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা একজন বিখ্যাত ব্যক্তি—সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠা—বয়সে প্রবীণ বৃদ্ধ—তিনি একদিন আশ্রমে এসে আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন।

আশ্রমের ছেলে মেয়েরা তাকে বাবা বলে ডাকত। কিন্তু শুনেছি তিনি তাঁর চোখে ধরলে বড় মেয়েদের নিয়ে যান সন্ধ্যায়।

তাঁর দৃষ্টি দেখে আমি ভয় পেলাম।

চলে—যাচ্ছিলাম—তিনি ডাকলেন—এই শোন্।

ফিরে এসে দাঁড়াতে হল। তিনি আপাদমস্তক আমাকে দেখে বললেন—যা। আমি পালিয়ে বাঁচলাম।

আমার একটি বল ছিল। কারণ আমি কখনও অবাধ্য হইনি—আমার ভদ্র নম্র ব্যবহারে আমাকে ভাল না বাসুক—আমার উপর খুশী ছিলেন সকলে।

খাওয়ার সময় আশ্রমের প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমাকে বললেন—কর্তা—কর্তা বলে গেছেন তোমাকে আর এখানে রাখা হবে না।

বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাব? আমার তো—

—না না। সে ভয় করতে হবে না। এ আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে পাঠানো হবে তোমাকে।

—সে কোথায়?

—বর্ধমান জেলায় একখানা গ্রামে মেয়েদের জন্যে আশ্রম আছে? সেখানে যাবে তুমি।

—আমার ভাই?

—সে এখানে থাকবে।

—এখানে সে থাকবে—আর আমি—

নিষ্ঠুর ধমক দিলেন বড় দিদিমণি। সেখানে সে কোথায় যাবে?

কি করব। তাই হল। ভাইয়ের বয়স সাড়ে ন বছর। সে রইল অনাথ আশ্রমে। আমি গেলাম বর্ধমান মেয়েদের আশ্রমে।

পাড়াগাঁয়ে শক্ত কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা অনেকটা জমি। কাঁটাতারের গায়ে গায়ে গাছের বেড়া; একটা ফটক দিয়ে ঢুকতে হয়।

সামনেই লেখা নারী কল্যাণ আশ্রম।

খড়ের চাল মাটির দেওয়াল ঘর। নানান বয়সের চল্লিশটি মেয়ে। শুনলাম এরা সবাই সমাজ পতিতা।

অবাক হয়ে গেলাম ভাগ্যের খেলায়।

অনাথ আশ্রমে গিয়ে জারজ সন্তান বলে পরিচিত হয়ে কলঙ্কিত করেছি—বাবা মাকে—নিজের জন্মকে। এবার পরিচয় হল আমি সমাজ পতিতা—এবার নিজেই কলঙ্ক সায়রের কালীজলে স্নান করে উঠলাম—কালো রঙ হয়ে গেল আমার—জন্ম কলঙ্কিত হয়েছিলো আনথ আশ্রমে। জীবন কলঙ্কিত হল নারী কল্যাণ আশ্রমে পতিতা পরিচয়ে।

পড়তে কষ্ট হচ্ছিল আমার।

পড়া বন্ধ করে মুখ তুললাম।

বিচিত্র ব্যাপার। হঠাৎ জয়ার সমস্ত করুণ ঘটনাকে পিছনে রেখে মনশ্চক্ষের সামনে দাঁড়াল এসে সুতপা।

সুরূপা এখন।

শ্যাম্পু করা চুল, লিপষ্টিক মাখা ঠোঁট—আঁকা ভুরু চোখের কোণে টানা কাজল। কপালে ছোট্ট একটি মটর দানার মত কুমকুমের টিপ। রুগ্না সুতপা নয়। সুস্থ উল্লাসময়ী রূপসী সুরূপা।

সে যেন হাসছিল।

কিছু বললে সে। সুতপা বা সুরূপা নিশ্চয়ই নয়। আমার মন, যে কল্পনায় সুতপার আত্মা—সেই বললে—দাদু ওইটে নিয়ে গল্প লিখে

দিলে ওই জয়ার পার্টটা আমি করব।

বললাম—ও ভূমিকায় তুমি জীবন দিতে পারবে না।

সে হেসে বললে—দাদু তুমি ওকে বল ও ষ্টেজে দাঁড়িয়ে নিজের এ কাহিনীটা বলে যাক। দেখ কত লোক শুনতে আসে। শত-খানেকেরও বেশী হবে না। এবং পঞ্চাশ জনেরও বেশী গল্পটা শেষ হবার আগেই উঠে যাবে। আর আমি যদি ওই পার্টটা করি ছবিতে তবে লোক ভেঙে পড়বে। হপ্তার পর হপ্তা হাউস-ফুল যাবে। তখনও যদি কোনদিন শোয়ের শেষে ওকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বল—যে—এই আসল জয়া, তখন সিটি পড়বে, চীৎকার করবে—বলবে ওকে হঠাও—সামনে থেকে হঠাও।

আমি অস্বীকার করতে পারলাম না।

আবার সামনে। আমার মনের সামনে এসে দাঁডাল জয়া। সুরূপা সুতপাকে আড়াল করে দাঁড়াল। জয়াকে কোন দিন চোখে আমি দেখি নি। তার চিঠি থেকে তার মনকে দেখেছি সেই জীবনকে দেখেছি যা কায়ার অন্তরের মধ্যে বাস করে। এ একটি মেয়ে—অতি সাধারণ বাঙলা দেশের শ্যামবর্ণ মেয়ে, দেহ শীর্ণ। চোখ দীপ্ত আর একরাশ চুল। সাধারণ মিলের আধ-ময়লা শাড়ী পরা, গায়ে নিজে হাতে কাটা সেলাই করা ছিটের ব্লাউজ। সায়াও তাই। পায়ে এক জোড়া স্যাণ্ডেল। মুখে কোন প্রসাধন নেই। বিষণ্ণতার মধ্যেও তার ঠোঁটে হাসি লেগে আছে।

সে বললে, সুরূপার কথা শুনেছি দাদা। ও তোমার নাতনী আমি তোমার বোন। আমি তোমার মত সে-কেলে এ যুগে বলতে হয় সে-কালিনী আর ও হল এ-কালিনী। ওর জীবনটায় অভিনয় বড়, আমার জীবনে 'অভিনয় নয়' বড়। আমি শিখিনি। দুঃখ যখন সফল হয় তখনই সে প্রমোদের হয় দাদা। তাই লোকে পয়সা দিয়ে ভীড় করে দেখতে আসে। নকল দুঃখের জন্যে চোখের জল ফেলতে ভালো লাগে সুখ আছে তাতে। সংসারে দুঃখ যেখানে সত্যি সেখানে মানুষের বড়

ভয়। যেখানে গিয়ে দেখতে গেলে পয়সা লাগে না তবু লোকে যায় না। আমার জীবনের অভিনয় সুরূপা তোমার করতে পারে,তা দেখতে লোকও আসবে ভীড করে, বিলাসিনী উল্লাসিনী সুরূপা বিষণ্ণ হলে কেমন লাগে দেখে মোহিতও হয়। কিন্তু ওই সুরূপাকে বল না কেন আমার সঙ্গে দুদিন এক সঙ্গে থাকতে তা সে পারবে না।

কথাটার প্রতিবাদ খুঁজে পেলাম না। এমন কি পিছুন থেকে সুরূপা কথা জুগিয়ে প্রম্‌ট করে দেবে ভেবে পিছনে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। সে সরে গেছে। যে নিয়মে আলো এলে অন্ধকার দূরে গিয়ে দাঁড়ায় কোন আশ্রয় ক'রে সেই নিয়মে স'রে গেছে।

আমার মনের কথা বুঝে জয়া হেসে বললে—যে নিয়মে সুরূপা তোমার আজ হটে গেল—সেই নিয়মে অভিনয়ের আসর থেকে আমিও হটে আসি দাদু' তবে সে পরের কাছে লজ্জা পেয়ে নয় নিজের কাছে লজ্জা পেয়ে। আমি অভিনয় করতে পারিনে—সেটা সুরূপা পারে। সেটা তার বড় একটা গুণ। ও গুণে হয় তো নিজের দুঃখকেও হাল্কা করে নেওয়া যায়। আমাব জীবনে দুঃখই বোঝা হল আর সে বোঝা দিনদিন ভারীই হয়ে চলেছে। ঘাড় আর তুলতে পারলাম না কোনদিন। ভুল বুঝবেন না আমাকে। সুরূপাকে আমি মন্দ বলছিনে। লজ্জা পায় না বলে নির্লজ্জ বলছিনে। সে লজ্জাকে জয় করেছে। আমি পারিনি।

বললাম—তা হলে বল তোমার দুঃখের কথাই বল। যে পর্যন্ত বলেছ তার পর থেকে সুরু কর। মিলিয়ে দেখি তোমার অকৃত্রিম পাথরের বোঝার মত দুঃখের বোঝা বেশী সত্য না—সুরূপা যে দুঃখের পাথরে কেটে—একটি সুন্দব বিগ্রহ তৈরী করেছে সেই বিগ্রহটি বেশী ভারী বেশী সত্য।

জয়া বললে—না দাদা—আমার দুঃখ বেশী ভারী বেশী সত্য এ বলে আমার কোন দাবী নেই।

অতি প্রসন্ন অথচ উদাস হাসি তার মুখে ফুটে উঠল।

আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

আমার কল্পনার জয়া মানস চক্ষের সামনে থেকে সেই দীর্ঘশ্বাসটুকু কুড়িয়ে নিয়ে মিলিয়ে গেল। এর চেয়ে বেশী পাওনা তার নেই সে তা জানে।

আমার চোখের সামনে তার যে চিঠিগুলি পড়েছিল তাই তুলে নিলাম। প্রথম চিঠি ঠিক চিঠি নয়—তার নিজের হাতে লেখা অসংখ্য বানান ভুলে ভরা তার নিজের জীবনকাহিনী।

কৈশোরে এসে ভাইকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল অমাথ আশ্রমে। অনাথ আশ্রমে যারাই আশ্রয় নেয়—তাদের সব পূর্বপরিচয় মুছে যায়, আশ্রমের কর্তৃপক্ষ থেকে সাধারণ লোক—সবাই তাদের ভাবে এবং তাদের কাছে তাদের পরিচয় হয় তারা জারজ সন্তান।

এটা কিশোরী জয়ার বুকে কঠিন ভাবে বেজেছিল। কিন্তু তখনও জানত না যে তার আবার একটা নূতন পরিচর তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে।

যুবতী হতেই তাকে কর্তৃপক্ষ অনাথ আশ্রম—যেখানে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে থাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দেন সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র, পতিতা উদ্ধার আশ্রমে।

জয়া এই কেন্দ্রে এল—দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করেছিল—পতিতা পরিচয়। সেই পরিচয় নিয়েই তাকে প্রবেশ করান হল আশ্রমে।

আশ্রমের মেয়েগুলির সকলেই প্রায় প্রৌঢ়া। সাধারণতঃ লেখাপড়া না-জানা মেয়ে, কয়েকজনের তিন কুলে কেউ নেই। কয়েকজন সত্যই সমাজপতিতা—তারাও পতিতজীবনে সমৃদ্ধির বয়স পার হয়ে এখানে এসে জুটেছে।

এদের আশ্রয় দেওয়ার মূল্যে সত্যকারের করুণা কতখানি- তা ঠিক বুঝতে পারেনি জয়া। ওরা হাতে কলমে কিছু কাজ করতো—বলতে গেলে মজুরিণীর কাজ, গাছে জল দেওয়া গাছের গোড়া পরিষ্কার করা, কিছু সব্জী উৎপাদন করা—এই নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল। খোলা ডাঙ্গার মধ্যে খান তিনেক ঘর। একখানা বেশ লম্বা। খড়ের চাল—ছ

পাশে খুঁটি দেওয়া মাটির বারান্দা। মধ্যখানে পাশাপাশি খানকয়েক ঘর; তার মধ্যে থাকতো এই সব মেয়েরা, আর একখানা এমনি ধরণের ছোট বাংলো তার মেঝে বাঁধানো ; সেটা আপিস এবং ওখানকার যিনি ভারপ্রাপ্ত মহিলা প্রতিভাদি থাকতেন। রমাদির শক্ত সমর্থ দেহ, পুরুষালি গলা, তেমনি ভঙ্গি; বেশ আধুনিক ঢঙে ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে সকাল থেকে রাত্রি আটটা নটা পর্যন্ত শুধু শাসনই করে বেড়ান! আপিসে বসে দু চারখানা চিঠি লেখেন। দুজন দারোয়ান বা রক্ষক আছে—তারা খানিকটা দূরে একখানা ছোট ঘরে থাকে। সমস্ত আশ্রমটার চারিদিকটাই উন্মুক্ত, শুধু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। পাশ দিয়ে চলে গেছে কয়েকটা পায়ে চলা রাস্তা, একটা উত্তরদিক থেকে, একটা পূর্বদিক ঘেঁষে একটা গাড়ীচলা কাঁচা রাস্তা পশ্চিমদিক দিয়ে গিয়ে মিশেছে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে। আগে পায়েচলা রাস্তাগুলো কিছু দূরে দূরে ছিল—কিন্তু আশ্রম হওয়ার পর থেকেই পথচারীরা সম্ভবতঃ আশ্রমবাসিনীদের একটু ভালভাবে দেখতে পাওয়ার বাসনায় কাছ ঘেঁষে চলে রাস্তাটাকে কাছিয়ে এনেছেন। পুরানো পথরেখার উপর ঘাস জন্মে গেছে।

প্রথম দিন এসে পৌঁছেই—তাকে প্রথম যেতে হয়েছিল—রমাদির কাছে। ষ্টেশনে গিয়েছিল একজন দারোয়ান—ওদিক থেকে সঙ্গে এসেছিল কলকাতা অনাথ আশ্রমের লাবণ্যদি। দুটো আশ্রমই—সুরমাদি'র অধীনে। অনাথ আশ্রম এবং পতিতা আশ্রম দুটোই।

সুরমাদিদি সম্পর্কে অনাথ আশ্রমেও সে অনেক কথা শুনেছিল। সুরমাদি ছিলেন বিজয়ার কাছে বিস্ময়ের মানুষ।

অনাথ আশ্রমের সর্বেসর্বা। প্রতিষ্ঠাতা মস্ত নাম করা একজন মানুষ, অনেক প্রতিপত্তি অনেক অর্থ—মজুমদার ; এই মজুমদার পর্যন্ত তার কথায় উঠতেন বসতেন। সুরমাদি নিজের মনে কাজ করে যেতেন কিন্তু যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন তখন প্রতিষ্ঠাতা মজুমদার পর্যন্ত ভয় পেতেন।

অনাথ আশ্রম থেকে আসবার কিছুদিন আগে ওখানকার একজন শিক্ষয়িত্রী বিন্দুদি তিনি মেয়েদের সেলাই উলের কাজ এবং গৃহস্থালীর কাজ শেখাতেন; জয়াকে তখন তাঁর সহকারিণী করে নেওয়া হয়েছিল। ওই ষোল সতের বছর বয়সেই সে পারঙ্গমা হয়ে উঠেছিল। বিন্দুদি জয়াকে ভালবাসতেন এবং তার সঙ্গে অনেক প্রাণের কথা বলতেন। বয়সে প্রায় পঞ্চাশের কাছে পৌঁছেছেন বিন্দুদি। ফেরতা দিয়ে কাপড় পড়তেন কাঁচাপাকা অল্পচুলে গুছি জুগিয়ে মানানসই খোঁপা বাঁধতেন। পান দোক্তা খেতেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, জানিস জয়া, ওই সুরমাদি'ই সব। মজুমদার ঢাক, ওকে বাজায় সুরমাদি যেমন বলায় তেমনি বলে। কেন জানিস?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নীরবে সে—বিন্দুদির মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

কথা হচ্ছিল রাত্রিবেলা ঘরে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে। আলোটা জ্বলছিল—জয়া একখানা বই পড়ছিল। জয়া বই থেকে দৃষ্টি তুলে বিন্দুদির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বিন্দুদি বলেছিল—ভালবাসা।

—ভালবাসা? বিস্ময়ের অবধি ছিল না জয়ার।

বিন্দুদি বলেছিল ওই কর্তার সঙ্গে মানে মজুমদারের সঙ্গে সুরমা-দি'র নাকি ছেলে বয়সে ভাব হয়েছিল। প্রেম, প্রেম! তা মজুমদার ছিল গরীব, আর সুরমাদি'রা বড়লোক। বিয়ে হয়নি। মজুমদার মনের দুঃখে গ্রাম থেকে চলে এসেছিল। তারপর ব্যবসা করেছিল। ছোট থেকে বড় ব্যবসা। অনেক বড। তারপর যুদ্ধের সময় লাখ লাখ টাকা পেয়েছে। এই সময়ে হঠাৎ খবর পায় যে সুরমাদি বিধবা হয়েছে। শুধু বিধবা নয়, ওর স্বামী বার্মাতে বড় চাকরি করতেন। আসবার সময় মারা যান। একটা ছেলে একটা মেয়ে ছিল তারা ওই আসবার পথে হারিয়ে যায়। এখানে কোন রকমে যখন এসে উঠলেন—তখন বাপ-মা মারা গেছে। ভাইরা জায়গা দিলে কিন্তু সে অনেক অপমান ক'রে দিলে। সুরমাদি'র স্বামী ছিলেন লেখা পড়া জানা লোক, তিনি সুরমাদিকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বারো বছরের ঘর করার

কালের মধ্যে ম্যাট্রিক আই-এ পাশ করিয়েছিলেন। আর সুরমাদির বাবার গুষ্ঠী পাড়াগাঁয়ের জমিদারগুষ্ঠী। জমি জমা জমিদারী এই নিয়ে ব্যাপার, গ্রামে দাপট। সুরমাদি'র স্বামী ওদের খুব ঠাট্টা করতেন। ওদের বলতেন "কুয়োর ব্যাঙ"। সুরমাদি নিজে লেখাপড়া শিখেও স্বামীর মতটাই নিজের মত করে নিয়েছিলেন। ভাই ভাজদের খুব উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখতেন। লিখতেন "মেয়েদের ছেলেদের লেখা পড়া শেখানোর পাট তোমাদের নেই। তোমরা ভাব তোমাদের গ্রামের বাইরে যাবার দরকার নেই কারণ চাকরি করতে হবে না। জেলার সদরে সায়েবদের সেলাম করতে জানলে আর মামলা সেরেস্তা বুঝলেই হয়ে গেল। আমার অবস্থা যা হয়েছিল প্রথম প্রথম এখানে এসে –সে আমি জানি। আজ লেখাপড়া শিখে সব বুঝছি। কুয়োর ব্যাঙ বলেন উনি তোমাদের। সে কথা মিথ্যে নয়।"

এখন সব হারিয়ে যেদিন সুরমাদি বাপের বাড়ি ফিরলেন তখন ভাই ভাজেরা তার শোধ নিলেন। ভাঁড়ার আর রান্নার তদারক রাখতে দিলেন। মধ্যে মধ্যে রাঁধতেও হত। মজুমদার গ্রামে দুটো ইস্কুল করেছিল। একটা ছেলেদের হাইস্কুল অন্যটা উচ্চ প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়। মাস দু তিন পর অবস্থা অসহ্য হলে সুরমাদি মজুমদারকে পত্র লিখেছিলেন। সব কথা জানিয়ে লিখেছিলেন— বালিকা বিদ্যালয়ে আমাকে তুমি যদি একটি চাকরি দাও তবেই তো বাঁচতে পারি—নইলে এই কষ্ট অপমান সইবে না—আমাকে বিষ খেয়ে মরতে হবে।

মজুমদার তখন খুব বড় লোক হয়েছেন। তাঁর খাতির অনেক কিন্তু সে গ্রামে বড একটা যেতেন না। তিনি ছুটে গেলেন গ্রামে। গিয়ে সুরমাদি'কে চাকরি দিয়ে এলেন। ইস্কুলের কর্তা সুপারিণ্টেডেণ্ট করে দিলেন। আলাদা কোয়ার্টার করে দিলেন। সুরমাদি সেখানে এলেন। কিন্তু গাঁয়ে দুর্নাম রটালে ভাজেরা। গ্রামের লোকেরা সায় দিলে। বললে, পুরনো ভালবাসা নতুন করে জাগিয়ে উঠেছে।

সুরমাদি লিখলেন মজুমদারকে সব কথা। মজুমদার তখন এই অনাথ আশ্রম খুললেন। বললেন—তোমার ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেছে তুমি এই নিয়ে থাক। তোমার মন খুসী হবে এতে। কে বলতে পারে হয়তো এখানেই কোনদিন তোমার হারানো ছেলেমেয়ে ফিরে আসতে পারে।

খুব ভাল লাগল সুরমাদির। তারপর—।

জয়া জিজ্ঞাসা করেছিল—তারপর কি? পেলেন ছেলে মেয়েকে?

হেসে বিন্দুদি বলেছিলেন—তুই নেকাবে। সত্যকারের নেকী।

—কেন?

মরণ, হাবালে পায় আর মলে জীয়ায় এসব সেই ষষ্ঠীর আর মঙ্গলচণ্ডীর কথায় আছে। এ কবলে কি হয়—না হাবালে পায়, মলে জীয়ায়। জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কবত কথা শুনত আর শেষে বলত এ ব্রতে কি হয় না মলে জীয়ায়, হারালে পায়। তার কথা সত্যি কিনা পরখ করতে, তার ছেলেকে তার স্বামীই গলা টিপে মেরে পুকুরের পাঁকে পুঁতে দিল। জয়াবতী—রান্না করছিল, সে গেল পুকুরে জল আনতে, যেমন পুকুরে ঘড়াটি ডুবিয়েছে অমনি মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় মরা ছেলে বেঁচে উঠে একেবারে পায়ের কাছে এসে তার আঁচল ধ'রে উঠে পড়ল। তবে হ্যাঁ—পেল বৈকি কিছু সুরমাদি।

—কি? প্রশ্ন করতে ভরসা পেলে না জয়া। আন্দাজে সে অনুভব করতে পারলে, বয়সে সে আর বালিকা নয়, তা ছাড়া এই অনাথ আশ্রমে ছন্নছাড়া ছেলেদের মধ্যে মানুষ হয়েছে। এসব ছেলে অল্প বয়সে পৃথিবীর ভালোর দিকটা বুঝুক বা না বুঝুক মন্দর দিকটা প্রায় সব বুঝে ফেলে।

বিন্দুদি বলেছিলেন—হাঁ করে চেয়ে রইলি যে? কোনদিন দোতলায় সুরমাদির ঘরে গিয়েছিস?

—গিয়েছি তো!

—দেওয়ালে ছবি দেখেছিস মজুমদারের ? রঙীন ছবি ?

—হ্যাঁ কিন্তু তাতে কি—উনি তো আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। সুরমাদিকেও যে উনি পিতিষ্ঠে করেছে। নেকী ছুঁড়িটা। সন্ধ্যে থেকে কতক্ষণ ওখানে আড্ডা চলে দেখেছিস আসবাব পত্র বিছানা বালিশের পরিপাটী দেখেছিস্! ফুলদানীতে ফুলের বাহার দেখেছিস। সুরমাদি কত রকমারি শাড়ী পরে দেখেছিস। যার স্বামী মরেছে—ছেলে মেয়ে সব হারিয়েছে—তার এত বাহার কেন না ? মজুমদারের উপর হুম্‌কী দেখেছিস ? যে মাইনে নিয়ে কাজ করে তার এত হুমকী খাটে মনিবের উপর।

সে দিন সারা রাত্রি ভেবেছিল জয়া। ঘুম হয়নি। কিন্তু এর কয়েকদিনের মধ্যেই বিন্দুদির কথা যে কত সত্য তা বুঝতে পেরেছিল। সে আশ্রমে কাজ করতে করতেও মজুমদার এবং সুরমাদির প্রতি পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিল। যে পদক্ষেপগুলির কোন অর্থই ছিল না—তার কাছে তার বিচিত্র অর্থ এবার যেন পথে পড়ে-থাকা একটা লতার টুকরো—অকস্মাৎ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে হিস্ হিস্ করার মত সজীব এবং সরস হয়ে উঠল।

এর পরেই হঠাৎ সুরমাদি তাকে একদিন ডেকে বললেন—দেখ, তোমাকে আর তো এ আশ্রমে রাখতে পারব না—তুমি বড় হয়ে উঠেছ। বুঝেছ!

চোখে অন্ধকার দেখছিল জয়া, সে কোথায় যাবে ?

—আমাদের এখানে একটা নির্দিষ্ট বয়সের বেশী বয়সের মেয়েদের রাখার নিয়ম নেই।

এবার জয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলেছিল—আমি কোথায় যাব ? আমার তো কেউ নেই। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছিল।

সুরমাদি বলেছিলেন, না না সে জন্যে ভেবো না তুমি। সে ব্যবস্থা আমরা করব। তুমি এখানে কাজ কর্ম ভাল করেছ, কাজ শিখেও ফেলেছ অনেক। তোমাকে দিয়ে কাজও আমরা পাব। আমাদের

নারী উদ্ধার আশ্রমের কথা তো শুনেছ। আমি তোমাকে সেখানে পাঠাতে চাই। সেখানে অনেক গেঁয়ো মেয়ে আছে যারা লেখাপড়াটড়া কিছুই জানে না। ঝি রাঁধুনীর কাজ ছাড়া কোন কাজও করতে পারে না। সেখানে পাঠাব তোমাকে। থাকবে সেখানে, তাদের সেলাইয়ের কাজ উল বোনার কাজ শেখাবে; লেখা পড়া কিছু কিছু শেখাবে। নাম তোমার সেখানে থাকবে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে।

খুসী হয়েছিল জয়া। এখানকার চারিদিক ঘেরা পাঁচিলের বাইরে বেরুতে পারলে সে বাঁচে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়েছিল। মনে পড়েছিল ভাইয়ের কথা। যাকে সে তিন বছর বয়স থেকে বুকে করে মানুষ করেছে। যে এই আশ্রমের মাঝের পাঁচিলটার ওপারে থাকে। মাঝে পাঁচিলটা থাকলেও এখানে সে এটা অনুভব করে যে সে কাছেই আছে। কোলের কাছে সে?

সুরমা বলেছিল—সে এখানে থাকবে। তাকে ছাড়ব কি করে?

কথাটা শুনে বিন্দুদি বলেছিলেন—ভাবছিলাম তাই। বলে—সে হেসেছিল।

—হাসলে কেন বিন্দুদি?

—হাসলাম।

—কেন, তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

—আমার বলতে মানা আছে। বলে কি চাকরিটা খোয়াব!

—কেন?

—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে—ওই সুরমাদির ঘরে যা কোন ছুতো করে, সেখানে—সুরমাদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখিস—জবাব পাবি!

আঁচে সে বুঝেছিল। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল বিন্দুদির মুখের দিকে। বিন্দুদি কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল—যা চলে যা। কত্তার যত বয়স বাড়ছে—সুরমাদি পুরনো হচ্ছে তত। থাক ভাই—

বুঝে নিস। চলে যা—ভাল হবে।

নিজে সুরমাদি তাকে নিয়ে মস্ত বড এই শড়কটার ধারে গ্রাম থেকে দূরে—শ'দুয়েক বিঘে প্রান্তরের মধ্যে এই আশ্রমটায় নিয়ে এলেন। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ফটকে বাঁশ দিয়ে তৈরী একটা ফটক। চারিপাশ অবাধ উন্মুক্ত। স্টেশন থেকে সাইকেল রিক্সায় আসবার পথে এই খোলা মেলা অবাধ প্রান্তর তার ভারী ভাল লেগেছিল। আশ্রমের মাঝখানে একটা সুন্দর পুকুর তার পাড়ে বাড়ি খান তিন চার।

মনটা ঘা খেল—ফটকের মুখে, মাথায় টাঙানো কাঠে-লেখা আশ্রমটার নাম দেখে। পতিতা উদ্ধার আশ্রম, নারী কল্যাণ কেন্দ্র। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করেই আশ্রমে ঢুকেছিল। মনকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিল—যে সে এখানে শিক্ষয়িত্রী হয়ে এসেছে। কিন্তু সুরমাদি আপিসের বাংলোটায় উঠে কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটায় ঢুকতেই—এখানকার ভারপ্রাপ্ত দিদিমণি প্রতিভাদি—তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—একে কোত্থেকে আনলেন সুরমাদি? এ যে জ্বলন্ত খাপরা গো! বয়স যে গণ্ গণ্ হয়ে উঠেছে।

—তুমি বড় নোংরা কথাবার্তা বল প্রতিভা!

—না, তা বলি না। বলছি বয়সটার কথা। আদালত থেকে নিয়ে এলেন বুঝি? ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল?

—না। আমাদের আশ্রমের মেয়ে। এসেছিল বারো তেরো বছর বয়সে। এখন বড় হয়েছে। কাজ কর্ম ভাল শিখেছে। সেলাই খুব ভাল করে, জামাটামার কাটও ভাল। উলও ভাল বোনে। কিছু লেখাপড়াও জানে। এখানে ও তোমার সঙ্গে এই সব শেখাবে মেয়েদের! যাও ওকে তুমি তোমার ঘরে জায়গা ক'রে দাও। সেখানে থাকবে ও।

—না। সে হবে না।

—কেন?

—ওটা আমার ইচ্ছে। আপনি নিজের কপাল বাঁচাতে—আমার কপাল খাবার জন্যে—এখানে নিয়ে এলেন—না ?

—প্রতিভা ! ধমকে উঠলেন সুরমাদি !

—আমি আপনাকে ভয় করিনে সুরমাদি !

—বুঝেছি। অনেক দূর এগিয়েছ। না ? খুব বেড়ে গেছ। তোমাকে আমি—কথাটা শেষ করলেন না সুরমাদি ! প্রতিভাও চুপ করে রইল।

একটু পর সুবমাদি বললেন—বেশ ওকে মেয়েদের সঙ্গেই থাকতে দিয়ো। ওখানেই থাকবে সে। চেঁচিয়ো না বেশী। মেয়েটা বাইরে রয়েছে শুনতে পাচ্ছে সব।

তবুও প্রতিভার কোনো কথা শোনা যায়নি। প্রতিভা বেরিয়েও আসেনি।

সুরমাদি'র কথাই শোনা গিয়েছিল আবার। শোন প্রতিভা, মাথা খারাপ করো না। মেয়েটি বড় ভাল। এত ভাল যে—ওর সঙ্কোচ হয় ওর দিকে মন্দ দৃষ্টিতে তাকাতে। না-হলে-ওকে ওখান থেকে বের করে এখানে আনতে আমি সহজে পারতাম না। তোমার মন্দ করবার জন্যে আমি ওকে আনিনি। এনেছি—ওকে দিয়ে সত্যকারের কাজ এখানে কিছু পাব বলে। ওকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখো না। ওকে বাঁচিয়ো। তুমি বাঁচবে, ও বাঁচবে, আশ্রমের উপকার হবে। নইলে কিছু দিনের মধ্যে আশ্রমের কেলেঙ্কারীতে দেশে কান পাতা যাবে না। আশ্রম উঠে যাবে। হাতে দড়ি পড়বে।

শিউরে উঠেছিল জয়া।

কখন যে চিঠি থেকে চোখ তুলে জয়ার লেখা কটা লাইনকে আশ্রয় ক'রে কল্পনায় ঘটনার এবং কথাবার্তার গিঠ দিয়ে দিয়ে জাল বুনতে সুরু করেছিলাম খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতেই চোখ নামিয়ে লাইন কটা আবার পড়ে দেখলাম। আশ্বস্ত হলাম যে, আমার কল্পনায় আমি

জয়ার লেখা তথ্যকে বিকৃত করিনি।

সে লিখছে, আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য প্রবল প্রতাপ মজুমদার সাহেবের সঙ্গে সুরমাদি'র সম্পর্ক ছিল স্বামী স্ত্রীর মত। শুনেছি বার্মা থেকে রেফুজি হয়ে এসেছিলেন সুরমাদি। পূর্ব পরিচয় সূত্রে মজুমদার সাহেবের কাছে চাকরির প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর অসীম প্রভাব ছিল মজুমদার সাহেবের উপর। তিনি আমাকে মজুমদার সাহেবের সামনে থেকে সরাবার জন্যে ওখানে পাঠালেন। কারণ আশ্রমের যুবতী মেয়েরা নিরাপদ ছিল না তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে।

জয়া লিখেছে কিন্তু ভদ্র ব্যবহারের—নম্রজীবনের একটা আত্মরক্ষার শক্তি আছে বোধ হয় ওই ভদ্রতা আর নম্রতার মধ্যে। তার উপর সততা থাকতে তার দর অনেক বেড়ে যায়। এটা আমি অনুভব করেছি। বোধ হয় সবটা ঠিক বলা হয়নি। তার সঙ্গে সাহস চাই! চোখে চোখ রেখে কথা বলবার মত একটা অসঙ্কোচ সাহস এবং সততা চাই! ওইটেই আমার জীবনের মূলধন। এই মজুমদার সাহেব যে মজুমদার সাহেব তিনিও কোনদিন আমাকে কোন কুৎসিৎ কথা বলতে পারেন নি।

আর যদি বলেন ওইটে আমার সৌভাগ্য তবে অমন দুর্ভাগ্যের মধ্যে ওটাই আমার পরম সৌভাগ্য। যার মাথার বোঝার ভারে ঘাড় ভেঙে যাচ্ছে তার চলার পথে কাঁটা যদি না থাকে তবে সে কি কম সৌভাগ্য?

জয়ার চিঠিতে আছে এই সৌভাগ্যের জোরেই আমি চরম দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম।

এখানকার নিয়ম ছিল কোন মেয়ের চরিত্র সম্পর্কে কোন রকম অপবাদ রটলে তার বিয়ে দেওয়া হ'ত জোর ক'রে। দিতেন স্বয়ং মজুমদার সাহেব। এখানে কাছে পিঠে ব্রাত্যপল্লী অনেক আছে। আমাদের পূর্ববঙ্গের নমশূদ্রের মত। আমি থাকতে থাকতেই একটি

তিরিশ বছর বয়সী সদ্‌জাতির মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক বুড়ো অক্ষর পরিচয়হীন ব্রাত্যজনের সঙ্গে। সে কেঁদেছিল অনেক কিন্তু কোন রকমেই রেহাই পায়নি।

অপবাদের কাদা আসত বাইরে থেকে। আশ্রমের চার দিকে তিনটে পায়ে-চলা পথ, একটা গরুরগাড়ী চলা পথ। যারা সব এই পথে হাঁটত তারা যেত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরতে। আশ্রমটা হওয়া অবধি আশপাশ গ্রামের লোকজন বিনা কারণেও এদিক দিয়ে ঘুরে ফিরে যেত।

গান গাইত, অশ্লীল ইঙ্গিত ক'রে কথা বলত, শিস দিত, হাডু ডু-ডু খেলত। মেয়েরাও উঁকি ঝুঁকি মারত না তা নয়। তবে হাডু ডু-ডু খেলার সময় নিতান্তই খেলা দেখার কৌতুক ও কৌতূহলেই তারা আশ্রমের মধ্যে এখানে ওখানে দল বেঁধে বসে খেলা দেখত।

বাড়াবাড়ি হলেই প্রতিভাদি দারোয়ান পাঠিয়ে ঝগড়া করতেন। পুলিশ আশ্রমকে স্নেহসহানুভূতির চোখে দেখত। সেখানেওকলুষ ছিল।

তবুও হলফ করে বলব—সব সময়ে নয়। সে ওই পথচারীদের মধ্যেও নয়। যেটুকু দেখলাম এই পৃথিবীকে এই দেশ সমাজের মধ্য দিয়ে তাতে এইটুকুই জোর গলায় বলে যাব যে এখানে ভাল মন্দ দুই-ই দেখে গেলাম। মেয়েদের মধ্যে সতীলক্ষ্মী দেখলাম—তারা সংখ্যায় কম নয়। অনেক। আবার প্রেতিনীর মত প্রমত্ত উল্লাসে যারা নাচে তারাও অনেক। আবার আর একদল আছে যারা জড় বস্তুর মত হাটে বাজারে বিক্রী হল কিন্তু জুয়োর ছকের গুটির মত অদৃষ্টের পাশা পাটির দানের চক্রান্তে নরকে পড়ল তারাও অনেক। পুরুষদের মধ্যেও ঠিক তাই। ভাল মন্দ এবং সংসারের চক্রে চক্রান্তে দুর্বলের মত পাক খেয়ে ছিটকে পড়ে টলতে টলতে পড়ল কাদায় কি নরকে, তারাও অনেক। ভালোর মধ্যে যারা খাঁটি ভালো তারাও কম নয়। আবার যারা দায়ে পড়ে ভাল তারাও অগুন্তি নয়। আমার মত অবস্থায় না পড়লে বুঝতে পারবেন একথা আমি বলব না। অনেকের

তৃতীয় নেত্র আছে, কিন্তু আমার মত যারা জীবনের ফলের ঝুড়ি ঘাঁটাঘাঁটি করলে—হাতে বেছে যারা একদিকে কাঁচা শক্ত ফল সুপবিত্র পাকাফল আবার কিছুটা দাগ ধরা ফল এবং পচা ফল বাছাই করলে—তারা এর সংখ্যা গণাগুন্তি ক'রে বলতে পারে।

আমি চরমতম দুর্ভাগিনী। কিন্তু সংসারে অসৎ অসত্যের পচা আমায় স্পর্শ করেনি। সুরমাদি সংসারের বিচারে আধ পচা। এবং অসত্যও তাঁর মধ্যে আছে। নইলে মজুমদার সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ককে তিনি ঢেকে বা চেপে রাখবেন কেন? তাঁর এই অনাথ আশ্রমেব কাজে ডুবে থাকার মধ্যে তাঁর হারানো ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যে অকৃত্রিম বেদনা—তাও ত সত্য! এই সুরমাদি'ও আমার মতের মতই মত পোষণ করেন। তবে বলেন—যারা অদৃষ্টের চক্রান্তে পাক খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ে ঘুরণ পাক লেগে মাথা ঘুরে কাদায় বা নরকে পড়ল—তাদের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু ওই প্রতিভাদি,—ও বলে—না। কুৎসিৎ হেসে বা ব্যঙ্গ ক'রে ট্যারা চোখ নাচিয়ে বলে—মরণ। ভালো? সৎ? সতী? লক্ষ্মী? সীতা? সাবিত্রী? এর মানেই বা কি—ঘরই বা কোথায়? নেই—নেই—নেই! কেউ এক টাকায় বিকোয় কেউ পাঁচে কেউ পাঁচশোয়—কেউ পাঁচ হাজার—কেউ পাঁচ লাখে। ছড়ানো টাকা। দেখ ভেল্কী দেখিয়ে দি! সে পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক! বলে হি হি করে হাসে। প্রতিভাদির মাড়ির উপরে কুকুর দাঁত দুটো উঠে থাকে। সেগুলো উঁচিয়ে ওঠে। ভয় হয়।

ওর ইতিহাসটা বলি। ও নিজেই বলেছিল।

মা বাপের তিন মেয়ে। প্রতিভা মেজো। ট্যারা, কালো—কিন্তু দেহখানি সুগঠিত একটু পুরুষালি গড়ন। আমি যখন তাঁকে দেখলাম তখন প্রতিভাদি পঁয়তাল্লিশ পার হচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু এখনও সে দেখতে যুবতী। বাপ মা বিয়ে একটা দিয়েছিল। সংসারও হয়েছিল তার। ওই মজুমদার সাহেব আর সুরমা দিদিদের দেশে গ্রামেই ছিল শ্বশুরবাড়ি। বাপের বাড়িও খুব বেশী দূর ছিল না। একটা মেয়ে

ছিল। স্বামী দেখতে ভাল ছিল। মেয়েটি ভাল দেখতে। স্বভাবেও সে বাপের মত। বাপ মানুষ নাকি ভাল ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অহরহ ঝগড়া হত প্রতিভাদির। ঝগড়া হ'ত টাকা পয়সার জন্য। নিতান্ত গৃহস্থ ঘর--আর নিজে ছিলেন টোলে পড়া পণ্ডিত, যজমানী করতেন—পুরোহিতের কাজ। বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ-শান্তি, দুর্গাপূজো এই সব। আর পণ্ডিতি করতেন টোলে।

প্রতিভাদির দিন রাত্রি অভিযোগ ছিল—এতে চলবে কি ক'রে? দাবী ছিল—আরও চাই।

তিনি বলতেন—পাব কোথায়?

—সে আমি কি জানি? যা ক'রে পার আন?

যাক;—তিনি মারা গেলেন দশ বছরের মেয়েকে এবং পঁচিশ বছরের প্রতিভাকে রেখে। মেয়েটির পর আর দুটি সন্তান হয়ে আঁতুড়েই মারা গিয়েছিল। প্রতিভাদি আজও বলে, বেঁচেছিলাম মরেছিল। মেয়েটা যদি ম'রে যেত তবে—।

কথাটা আর বেরুতো না মুখে। অন্যের এমন হলে প্রতিভাদি নিশ্চয় বলত—ঢঙ। ও সব লোক-দেখানি।

এ ধরণের কথা শুনে তারিফ করে অনেকে। বলে হ্যাঁ, সত্যি কথা বলেছে। আমি তা বলিনে। প্রতিভাদি সম্পর্কেও না!

বিধবা হয়ে প্রতিভাদি'র গালাগালির মুখ অবাধ হয়ে গিয়েছিল। স্বামীকে আর মা-বাপকে গালাগাল দিতেন বেশী! ওদের বলত পাঁঠা ওইটে তার প্রিয় গাল?' আজও বলে—কি বলব তা ছাড়া! তা না' হলে ওই অবস্থায় বিয়ে করে? পাঁঠাকে কাটতে নিয়ে যায় হাড়কাঠে, বাঁধা অবস্থায় বেলপাতা খায়। এরাও তাই দুঃখের হাড় কাঠ-বাঁধা অবস্থায় বিয়ে করে।

হেসে বলে আমিও তো তাই। ওই বাপের মেয়ে ওই স্বামীর স্ত্রী। আমিও নিজেকে বেচতে শুরু করলাম তার মৃত্যুর পর। ওই সুরমাদের

বাপের বাড়িতে ভাত র'াধতে গেলাম, গিয়ে পাকড়ালাম সুরমার ছোট ভাইকে। সেখানে জানাজানি হল, তাড়িয়ে দিলে। তারপর মজুমদার সাহেব এল গাঁয়ে, গিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে। সব পাঁঠা, সব পাঁঠা, সব পাঁঠা।

বলে কুকুর দাঁত বের ক'রে হাসত। বিশ্রী হাসি। সে হাসিতে যত বিষ তত নেশা। লোককে যেন মাতিয়ে তুলত উগ্র মাদকের মত। যারা শুনত তারাও হাসত।

সুরমাদির সঙ্গে এ নিয়ে তার বাদানুবাদ হয়েছে। বলছি সে কথা পরে। আমাকে নিয়েই হয়েছে।

আশ্রমে মেয়ে ছিল অনেকগুলি। পঁচিশ তিরিশ বয়সের মেয়ে গুটি ছয়েক। বামুন কায়স্থ বৈদ্য বেশী। অর্দ্ধেকের বেশী। বাকীরা সব অন্যান্য জাত। অধিকাংশই নিরক্ষর। সামান্য ক'জন লিখতে পড়তে পারে। রামায়ণ মহাভারত পড়া হ'ত। এরাই পড়ত সুর করে অন্যেরা শুনত। কিছু কিছু নাটক নভেলও পড়া হত। আর আমি কাটতাম সেলাই করতাম। ওদেরও পুরনো কাপড় কাটতে দেওয়া হত। নতুন কাপড়ও কয়েকজন পেত। তারা ওই ওখানকার মেয়েদের জামা সেমিজ তৈরী করতে দেওয়া হ'ত। আমার তৈরী জামা বাজারে যেত বিক্রীর জন্যে। ছেলেদের জামা প্যাণ্ট সার্ট, মেয়েদের ব্লাউজ আমি ভাল তৈরী করতাম।

এরই মধ্যে ঘটল ওই বিয়েটা। সে মেয়েটির নাম ছিল করুণা। বামুনের ঘরের বিধবা। ঝরঝরে চেহারা বছর ত্রিশেক বয়স। নিঃসন্তান। আঁট সাঁট গড়ন। দেখতে চটক ছিল। আমি ওখানে যাবার কিছু দিন আগে এসে পৌঁছেছে। গিয়েই শুনলাম মেয়েটি খুব পাজী। আশ্রমের নিয়ম নাকি মানে না। সকালে বিকেলে যে সমস্ত কাজ আছে খাটাখাটনীর তা করতে যায় না। মানে গাছের গোড়া খোঁছা, আগাছা তোলা—এ করতে মহা আপত্তি। জল তুলে দেওয়া তা সে

পারবে না। কারণ সে তা করেনি কখনও। তা ছাড়া বাইরের লোকের শিস্-ইসারা-গান এ সব সে কান পেতে শোনে। ময়লা কাপড় সে পরতে পারে না। সাজগোজে একটু বেশী মন।

আলাপ আমার সবার সঙ্গেই হয়েছিল। করুণার সঙ্গেও হয়েছিল। ওই প্রথম যখন এলাম তখনই সুরমাদি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে তাকে ডেকে আমার এবং প্রতিভাদির সামনেই তাকে সাবধান ক'রে দিয়ে গেলেন।

সে যখন এসে দাঁড়াল—তখনই তাকে দেখে আমার বেশ ভাল লাগল। ঝর-ঝরে পরিচ্ছন্ন বেশভূষা এবং চেহারাতেও শ্রী আছে' সুরমাদি বললেন—তোমার নামে—এ সব কি শুনছি ?

করুণা আঁচলের খুঁট নিয়ে পাকাতে লাগল উত্তর দিলে না।

সুরমাদি বললেন—জবাব দাও।

—কি জবাব দেব ?

—যা শুনছি তার।

—কি শুনছেন বলুন।

—তুমি কাজ কর্ম কর না। আশ্রমের নিয়ম মান না—

—আমি ওই মজুরিণীদের মত গাছের গোড়া খোঁড়া খোসা-আগাছা তোলা, জল তোলা এ সব কখনও করিনি, করতে পারব না।

—পারতেই হবে। তোমাকে এমনি কেউ বসে খেতে দেবে না।

—না দেবেন—বের ক'রে দেবেন—হরি বলে ভিক্ষে ক'রে খাব।

—হুঁ। তোমার সাতদিন রাত্রে খাবার বন্ধ রইল।

প্রতিভাদি বললে—তাতে ওর কি হবে ? চুরি ক'রে খাবে। ক্ষেতে শসা থাকে মূলো থাকে টমাটো থাকে নুন দিয়ে খাবে।

কথাটা গ্রাহ্য না করে সুরমাদি বললেন, তা ছাড়া বাইরে মানে বেড়ার বাইরে থেকে লোকের হাসি ঠাট্টায় কান দাও ?

আবার চুপ করে রইল করুণা।

—বল ?

—কি করব ? কালা নই, কানে আসে, আপনি দিতে হয় না।

—তুমি উত্তর দাও ইসারায় ?

—না।

প্রতিভাদি বললেন—দাও।

—না। না। না।

প্রতিভাদি রাগে ফেটে পড়লেন—না-না-না। তিন সত্যি। তুমি আমাব সতী লক্ষ্মীব শিরোমণি। বিধবা হয়ে কি কি করেছিলে আমি জানি না ? আমাকে বলনি ?

—যা করেছি করেছি তখন করেছি। এখানে এসে কিছু করিনি আমি। আবারও বলছি—না-না-না। কর্তা সেদিন এখানে এসে আমাকে ডেকে আমার সকল কথা শুনতে চেয়েছিলেন—শুনেছিলেন সে দিন থেকে তুমি এমনি করছ আমাকে। আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন—আমি চলে যাই। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

আরও কথা-কাটাকাটি হয়েছিল—সে সব থাক। প্রতিভাদি অনেক অশ্লীল কথা বলেছিলেন।

সুরমাদি—প্রতিভাদিকে থামিয়ে—করুণাকে বেশ শক্ত করে শাসিয়ে বলেছিলেন—

—বেশ তুমি তা হলে রান্নার কাজ করবে। ঘরগুলো ঝাঁট দেবে। এ কাজ বামুন কায়েত বদ্যি সব ঘরেই আছে। গেরস্ত বাড়িতে সকলেই করে। এ না বললে চলবে না।

—করব।

—আর বাইরের ওই সব নোংরা ব্যাপারে মন দিয়ো না, ভাল হবে না। ওই তারের বেড়ার কাছে কখনও যেতে পাবে না তুমি। এই পুকুরের চারিপাশ ছাড়া—অন্যদিকে যাওয়া তোমার বারণ রইল।

—যাব না।

সুরমাদি আমাকে বললেন—ওকে একটু লেখাপড়া শিখিয়ো। যত্ন নিয়ো, কেমন ?

বলেছিল—হঁ্যা। নেব।

সুরমাদি চলে গিয়েছিলেন। আমার জায়গা হয়েছিল যে-ঘরে, সে ঘরটা পুকুরটার পশ্চিম পাড়ের উপর বড় লম্বা ব্যারাকের মত বাড়িটার দক্ষিণ দিকে একটেরে। এখানাই ছিল প্রথম আমলের আপিস। ফালি একখানা ঘর। তার পাশের ঘরটাতেই থাকত করুণা।

ক'দিন মেলামেশা ক'রে বুঝেছিলাম করুণা খুব জটীল মনের মেয়ে। ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা। বেরিয়েছিল খেটে জীবিকা উপার্জন করবে বলে। রাঁধুনীর কাজ করবে। কাজ এক জায়গায় পেয়েছিল। কিন্তু বিতাড়িত হয়েছিল দুর্নাম নিয়ে। তারপর ভিক্ষা; যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন সাজে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে ভিক্ষা চাওয়াটা আয়ত্তও করেছিল। ট্রেনে ভিক্ষে করতে করতে গিয়ে পড়েছিল—রেলকারখানা চিত্তরঞ্জনের ধারে। সেখানে এক ভিন্ন ভাষাভাষী ভদ্রলোকের কাছে ভিক্ষে করতে গিয়ে নজরে পড়েছিল। লোকটি অবস্থাপন্ন। ভিক্ষে দিয়েছিলেন—তিনি পাঁচ টাকার নোট। তারপর তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সে কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে। তার মধ্যে সে বলেছিল ভিক্ষে না ক'রে সে যদি তার সঙ্গে যায় তার ঘরের কাজ কর্ম করে তবে সে তাকে নিয়ে যেতে রাজী আছে। করুণা জিজ্ঞাসা করেছিল—কি কাজ? সে বলেছিল—আমার সেবার কাজ। আমার যত্ন করতে হবে সেবা করতে হবে। আর কি?

কথাটার মধ্যে গোপন সে কিছু রাখেনি।

রাজী হয়ে গিয়েছিল করুণা। রাজী সে রাজী। বেশ হিসেবীর মত বলেছিল—কিছুদিন পরে তাড়িয়ে দিলে কি হবে তখন?

সে বলেছিল—টাকা দেব।

—দেবেন তার প্রমাণ কি?

—সে বিশ্বাস করতে হবে। ধর তোমাকে যদি মেরেই ফেলি তো কি করবে তুমি?

রওনাও সে হয়েছিল—তার সঙ্গে। জেনানী ক্লাসে তাকে তু'লে

দিয়েছিল। বলেছিল—আমি এসে নামিয়ে নেব। মাঝে মাঝে খোঁজ ক'রে যাব। তার আগে কোথাও নেমো না।

ভদ্রলোক ভাঙা বাংলায় কথা মন্দ বলত না।

কয়েকটা স্টেশন যেতে যেতে করুণার আপশোষ হয়। প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। ভয় লাগে। কিন্তু নেমে পড়তে পারেনি।

হঠাৎ গয়া জংশনে—সে নেমে পড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত। স্টেশন প্লাটফর্মে নেমে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে গিয়ে টিকিট কালেক্টরের হাতে ধরা পড়ে। ও গাড়ীটা তখন ছাড়ে-ছাড়ে। যে ভদ্রলোক তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার নজর পড়েছিল ওভার ব্রিজের মুখে টিকিট কালেক্টর আর করুণার দিকে। তিনি নেমে এসেছিলেন—এ কি, ইখানে কুথা যাচ্ছে তুমি? আঁ?

করুণা চিৎকার ক'রে উঠেছিল—না, না আমি যাবনা। আমিযাব না।

সেই মুহূর্তেই ওভার ব্রিজ ধরে নেমে প্লাটফর্মে আসছিলেন মজুমদার সাহেব! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মজুমদারের। থমকে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন—কি হয়েছে? তুমি বাঙালী?

সাহেবী পোযাক পরা লোকটির মুখে বাংলা কথা শুনে করুণা কাতরস্বরে বলে উঠেছিল, বাঁচান আমাকে বাঁচান। এ আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

—ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

ট্রেনটা তখন ছেড়েছে, লোকটি বেগতিক দেখে ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছিল। মজুমদার সাহেব চিৎকার করেছিলেন পাকড়ো পাকড়ো পাকড়ো। কিন্তু ট্রেন তখন গতি দ্রুত ক'রেছে এবং লোকটি কামরার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর মজুমদার সাহেবকে আঁকড়ে ধরেছিল করুণা।

সমস্ত শুনে মজুমদার সাহেব বলেছিলেন, ভয়নেই তোমার। আমি তোমাকে আশ্রয় দেব। আমাদের একটি নারী কল্যাণ কেন্দ্র আছে। সেখানে নিরাশ্রয় অনাথ মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া হয়। কলকাতার

পথেই পড়বে। সেখানে তোমাকে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে যাব।

মজুমদার সাহেব কলকাতার পথেই মাঝখানে নেমে তাকে আশ্রমে দিয়ে গেছেন। সেবার একদিন থেকে তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে গিয়েছিলেন। মধ্যে আরও একবার এসে তার সঙ্গে অনেক গল্প করেছেন। তার ইতিহাস শুনেছেন। বলেছেন—ভাল উদার পাত্র পেলে বিয়ে দিয়ে দেবেন তার।

করুণা তাতে সায় দিয়েছে কিন্তু সর্ত্ত তার সৎজাতি হওয়া চাই পাত্র। শহরের মানুষ হওয়া চাই। পাড়াগাঁয়ে সে বিয়ে করবে না।

করুণা জয়াকে বলেছিল, কোন বাঙালী ভদ্রলোকের আশ্রয়ে সে বিবাহ না করেও থাকতে রাজী আছে। তবে সে সত্যকারের ভদ্রলোক হওয়া চাই। আর বিপত্নীক হওয়া চাই।

কিন্তু আশ্রমের তা নিয়ম নয়। বিবাহ ছাড়া আশ্রম কোন মেয়েকে কোন পুরুষের হাতে দেয় না। তবে হ্যাঁ, চাকরি হলে যেতে দেয়। কিন্তু তাতেও তারা অনেক সন্ধান ক'রে তবে ছেড়ে দেয়।

এই করুণা।

করুণার বুকে সাহস ছাড়াও একটা বল ছিল সেটা মজুমদার সাহেবের স্নেহের বল।

প্রতিভাদি তার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল এই জন্যে।

*　　　*　　　*

জয়া তাকে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করেছিল। করুণা আগ্রহের সঙ্গে শিখতেও চেয়েছিল। কিছুটা লেখাপড়া সে জানত। উচ্চ প্রাইমারী পর্যন্ত পড়া ছিল তার। ক'মাসে সে বেশ খানিকটা এগিয়েছিল। জয়া তাকে শরৎবাবুর বই পড়তে দিত। জয়ার বিদ্যেও সামান্য—তবুও তা ক্লাস নাইন পর্যন্ত পাঠ্য তার পড়া ছিল। অনাথ আশ্রমে এতদূর পর্যন্ত সে এগিয়েছিল। জামা কাটা সেলাই এতে খুব আগ্রহ ছিল না করুণার। গোগ্রাসে সে পড়তে চাইত উপন্যাস। রামায়ণ মহাভারত সে খুব পছন্দ করত না।

জয়া যাওয়ার তিন মাস পরে অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটল। ঘটনা-ঘটল যেদিন মজুমদার সাহেব আশ্রমে উপস্থিত সেই দিন।

গভীর রাত্রে হঠাৎ চিৎকার উঠল—কে? কে? কে? পাকড়ো পাকড়ো পাকড়ো!

অন্য কেউ নয়, করুণা।

সে ছুটে পালিয়ে আসছিল মাঠের মধ্য দিয়ে। টর্চের আলোয় তার সাদা কাপড় পরা মূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন মজুমদার সাহেব এবং প্রতিভাদি। সাহেব খাতাপত্র দেখছিলেন। চিৎকার শুনে দারোয়ান বেরিয়ে এসে সাদা মূর্তিটাকে তাড়া করেছিল। করুণার দুর্ভাগ্য সে হুচোট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল—ব্যারাক বাড়িটার নিচেই।

করুণা ধরা পড়ল, সে চোরের মত ছুটছিল।

কোথায় গিয়েছিল কেন গিয়েছিল—প্রশ্ন ক'রে কোনও উত্তর মেলেনি তার কাছে।

এর পর সিদ্ধান্ত হয়ে গেল করুণা সম্পর্কে। করুণার বিয়ে দেওয়া হবে। বিয়ের পাত্র প্রৌঢ় ব্রাত্য; অবস্থায় সম্পন্ন ব্যক্তি। ওখানটার কাছাকাছি কয়লার কুঠী আছে। ওখানকার ব্রাত্যদের মধ্যে অনেক সম্পন্ন ব্যক্তি আছে। একজন বিপত্নীক প্রৌঢ় ব্রাত্য—সে আশ্রমকে এক হাজার টাকা দান করলে; তারই সঙ্গে রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে হয়ে গেল করুণার।

করুণা আপত্তি করল না। বিয়ে করে চলে গেল।

যাবার সময় করুণা জয়াকে বলে গিয়েছিল—তোমাকে বলে যাই জয়াদি। সে দিন রাত্রে আমি মজুমদার সাহেবকে পাকড়াতে গিয়েছিলাম নিজে থেকে। ধরা পড়ে গেলাম। ওই রাক্ষুসীটা ছিল। তা ঠকিনি—জিতেছি। এ লোকটার মত টাকা না থাক—টাকা আছে। আর মজুমদার সাহেব থেকে বয়সে কম বাঁচবে কিছু দিন। আরওআছে। লোকটা লেখাপড়ায় আমার চেয়ে বেশী বিদ্বান নয়! ওকে আমি মুঠোতে বাঁধতে পারব। তোমাকে কথা দিচ্ছি লোকটাকে সত্যি সত্যি

স্বামীর মতই ভজব আমি। জাত গেল—যাক ধর্মকে আমি ফিরিয়ে পাবই . কিন্তু সাবধান হয়ো জয়াদি। আমি ভালবাসি বলে ব'লে গেলাম।

আগেও এরকম বিয়ে আরও একটা নাকি হয়েছে। কলকাতার আশ্রমেও তাই। অনাথ আশ্রমের মেয়েদের বিয়েতে জাত কুল কে দেখে? আর এ রকম বিয়েতে মজুমদার সাহেব এই সব সম্পন্ন ব্রাত্যদের পছন্দ করেন। বলেন—বামুন, কায়স্থ, বৈদ্য—এরা যখন অনাথ আশ্রমের মেয়ে বিয়ে করতে চায়—তখন তারা পত্নী চায় না। চায়—উপপত্নী। তার থেকে এরা অনেক ভাল। উঁচু জাতের মেয়ে বলে খাতির করবে। জন্ম তার যেমনই হোক। জাত কি হবে? যে জাতের হোক—মানুষ, ধর্ম তো মানুষের কর্মে, ওইটে থাকলেই সব থাকল।

কথাবার্তা মজুমদার সাহেব ভালই বলেন। জানেন অনেক।

জয়া লিখেছে। তার পত্রের দিকে তাকালাম।

লিখেছেন—বলেছি মানুষের মধ্যে সব-ভাল মানুষ আছে। তাদের কতক সত্যিই সব-ভাল মানুষ। কতক দায়ে পড়ে সব-ভাল ব্যক্তি। মন্দও তাই। এদের থেকে ভাল এবং মন্দ দুই মেশানো মানুষই বেশী। এরা কিছু ভাল কিছু মন্দ। এদের মধ্যে একটা জাত আছে যারা কতক কতক জায়গায় বা কখনও কখনও খুব ভাল—সত্যিকারের মহৎ, দুর্লভ মহত্ত্বে মহৎ। আবার তাদের মধ্যেই এমন মন্দ আছে যে সে মন্দের কথা ভাবা যায় না। মজুমদার সাহেব এই ধরণের মানুষ।

আমার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়তে সুরমাদি আমাকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতা থেকে দূরে ওই নারী কল্যাণ কেন্দ্রে। কিন্তু নারী কল্যাণ কেন্দ্র তাঁর হাত থেকে তো দূরে নয়। ওই যেবার করুণার বিয়ের আগের ঘটনাটা ঘটল সে-বারই তাঁর দৃষ্টি পড়েছে আমার উপর। করুণা বিয়ের পর নিজের ঘরে যাবার সময় বলে গিয়েছিল—"তুমি সাবধান হয়ো জয়াদি"।

আমি সাবধান চিরদিন। এই আশ্রমেরই ভোলাদি- ভোলা দাসী একটি প্রৌঢ়া মেয়ে। সে আমাকে বলেছিল—তোমার মধ্যে শুচিবাই

আছে জয়া।

জয়া আশ্চর্য হয়ে বলেছিল—শুচিবাইয়ের কি দেখলে ভোলাদি? সত্যিই ছোঁয়ায় নাড়ায় লোকের সঙ্গে ব্যবহারে কোথাও শুচিবাইয়ের কোন ছোঁয়াচই তার ছিল না। মানুষকে অপবিত্র সে কোন দিনই ভাবেনি। কোন আচরণে তা প্রকাশ পায়নি।

লাবণ্য বলে একটি মেয়ে প্রতিবাদ করে বলেছিল—এ তুমি ভাই মিথ্যে দোষ দিচ্ছ।

ভোলাদাসী বলেছিল—জয়া মিথ্যে কথা বলতে পারে?

—তাতে শুচিবাইয়ের সঙ্গে কি আছে?

ভোলাদাসী তার জবাব না দিয়ে আবার প্রশ্ন করেছিল—বাইরে মাঠে আশপাশ গাঁয়ের ছোঁড়ারা এসে লাফালাফি করে শিষ দেয় গান গায়—জয়া সে দিকে তাকায় কোন দিন? হাসে কোন দিন? বেশী বাড়াবাড়ি করলে ঘরে ঢোকে না?

—সব সত্যি। তার মধ্যে শুচিবাই কোথা পেলে?

ভোলাদাসী হেসে বলেছিল—ওর মধ্যেই আছে। ওতো এক ধরণের শুচিবাই।

—মরণ তোমার!

—আমি মরেছি অনেকদিন লা। অশুচি বাইয়ে মরেছি।

—ও মরবে শুচি-বাইয়ে। কর্তাকে ফিরে আসতে দে না আর বার তুই।

দেখবি। করুণা যে দোষে গেল—ও তার উল্টো দোষে যাবে। দেখিস! এ সব কথাবার্তা হত—সেলাইয়ের আসরে। দুপুর বেলায়। অধিকাংশ মেয়েই সেলাইয়েব কাপড় কোলের উপর রেখে সুচ সুতো শুদ্ধ হাত মাটিতে রেখে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমুতো। শিখত দু চার জন। ভোলাদাসী অবশ্য শিখবার আগ্রহে জেগে থাকত না—সে জেগে থাকত দিনে ঘুমুলে অম্বল হয় বলে। আর অম্বল হ'লে বিকেল থেকে তার খুব কষ্ট হ'ত। রাত্রেও পর্যন্ত এক একদিন ঘুমুতে পারত না।

হেউ হেউ ক'রে ঢেকুর তুলত এবং গ্লাস গ্লাস জল খেত। সে জেগে থাকত বাধ্য হয়ে। অন্যকে জাগিয়ে রেখে গল্প করত অনর্গল। জয়া কাজ শেখাতো—সে বেশী আমল দিত না তবুও মধ্যে মধ্যে এসে তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিত—সেলাইটা পাশে রেখে।

সে সমস্তটা শুনে হেসেছিল জয়া। বলেছিল, ওটা আমার থাক ভোলাদি। ওইটেই আমার জীবনের মূলধন! বাঁচবার সম্বল।

—বাঁচতে হবে ভাই অনেক দুঃখে।

দু'জনের কথাই সত্যি।

করুণার বিয়ের সময় মজুমদার সাহেব আসেননি। কিছুদিন পরই এলেন। সব ইনস্‌পেকশন ক'রে সে দিন জয়াকে ডাকলেন। উপলক্ষ্য অনাথ আশ্রমে জয়ার ভাই বিজয় অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিভা পাশে ব'সেছিল।

জয়া দাঁড়িয়ে ছিল টেবিল ধরে।

মজুমদার সাহেব বলেছিলেন—বস, তুমি বস।

এই সময় সাহেবের চা কেক প্যাস্ট্রি এসেছিল। ও সব তাঁর সঙ্গেই থাকে। তাঁর নিজস্ব বেয়ারা ট্রেতে ক'রে দু'কাপ চা কেক প্যাস্ট্রির পাত্র এনে নামিয়ে দিয়েছিল। সাহেব একটা কাপ প্রতিভাদিকে দিয়ে অন্যটা তুলে জয়ার সামনে এগিয়ে ধরে বলেছিলেন,নাও। বেয়ারাকে বলেছিলেন—আমার জন্যে আর একটা আন।

—না-না। আমি তো চা খাই না।

—আমার অনারে আজ না-হয় খেলে। খাও! নাও-নাও।

প্রতিভা ধমক দিয়ে বলেছিলেন—কি হচ্ছে? আদুরীপনা না-ঢঙ? নাও না! দিচ্ছেন!

মজুমদার সাহেব বলেছিলেন হেঁকে—ওরে মধুর শিশিটা আনিস। —তারপর প্রতিভাকে বলেছিলেন—তোমাকে একটু মধু খাওয়াব। শিলংয়ের কমলা ফুলের মধু।

খেলে কথাগুলো মিষ্টি হবে তোমার!

প্রতিভা ঝেঁকে উঠেছিল—নিমফল-মধু দিয়ে খেলে কি রোচে? তার থেকে মিষ্টি জিনিস মধু দিয়ে খান আরও মিষ্টি লাগবে! ওই ওকে দিন।

কঠোর স্বরে মজুমদার বলেছিলেন—প্রতিভা! বলেই কথা পালটে বলেছিলেন—বড দুর্দান্তপনা করছে তোমার ভাই। কি করব আমরা বুঝতে পারছি না। সকলের মত ওকে তাডিয়ে দেওয়া। আমি দিই নি। সেটা তোমাব জন্যে!

প্রতিভাব সাহস অপার। সে সেই ধমকের পরও বলে উঠল—কেন—জয়াই বা এমন কি-যে তার জন্যে তার ভাইয়ের উপদ্রব সইতে হবে?

বেশ কঠিন কণ্ঠে মজুমদাব বলেছিলেন—জয়ার অনেক গুণ প্রতিভা!

এর উত্তরেও প্রতিভা কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কঠিনতর কণ্ঠে মজুমদার সাহেব বলেছিলেন—চা খাওয়া হয়েছে তোমার? না-খাওযা হয়ে থাকলে কাপটা হাতে করেই বাইরে গিযে খাও! যাও।

এ আদেশ আর অমান্য করতে পারেনি প্রতিভা। কিন্তু ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে উঠে যেতে গিয়ে কাপটা পড়ে গেল ডিসের উপর থেকে। ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। মজুমদার সাহেব তিক্ত হেসে বললেন—যাক। যাও গিয়ে বেয়ারার কাছে চা নিয়ে খাও। আমাব কাপটাই নাও। আমার জন্যে নতুন করে তৈরী করতে বল।

প্রতিভা বেরিয়ে গেল।

মজুমদার সাহেব বললেন—তুমি এত ভদ্র তোমার এত গুণ যে তোমাকে স্নেহ না ক'রে পারি না।

জয়া হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে তাঁর পা দুটোর উপর উপুর হয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে কোন রকমে বলেছিল—আপনি আমার

বাবা। আমার দু'বছর বয়েসে বাবা মারা গেছেন। তার একমাস পর মা গেছেন। কাকা ছিলেন—পাগল হয়ে গেছেন। আপনি আশ্রয় না দিলে হয় তো কোনদিন ম'রে যেতাম। আপনি আমাদের বাঁচান—

—ওঠো! ওঠো?

অবাধ্য হয়নি জয়া, উঠেছিল। বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল মজুমদার সাহেবের চোখে জল দেখে। তাঁর চোখ থেকে জলের দুটি ধারা নেমেছে।

চুপ করে বসে আছেন সামনের দিকে তাকিয়ে।

জয়া হাত জোড় করে বলেছিল—হয়তো বাবার চেয়েও বেশী। আপনি ভগবানের মত আমাদের কাছে। বাবা মা যখন মারা যান তখন ওই ভাই ছিল দেড় বছরের; আমার সেই ছ'বছর বয়স থেকে আমিই ওকে বুকে ক'রে বয়ে বেড়িয়েছি।

মজুমদার সাহেব বলেছিলেন—বস মা বস।

জয়া ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল মা শব্দটি শুনে।

জয়ার লেখা সেই খাতা-ভর্তি চিঠিখানার দিকে তাকালাম। পৃষ্ঠাটা খোলাই ছিল।

"মজুমদার সাহেব সেই ধরণের মানুষ"

দু'লাইন আগে থেকে আবার পড়লাম। "কতক জায়গায় বা কখনও কখনও এরা খুব ভাল সত্যিকারের মহৎ, দুর্লভ মহত্ত্বে মহৎ।"

হ্যাঁ—আছে। এই সংসারকে আমাদের দেশে বলে—বহু রত্নের পুরী। বহু বিচিত্রের সংসার। এমন বিচিত্র মানুষ আছে বই কি! কিন্তু এ বৈচিত্র্যের প্রকাশ অকারণে এক দিক থেকে হয় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মত দুই দিকের স্পর্শ যোগে হয়। বিষও হয় অমৃতও হয়। বিষ অমৃত হয়, অমৃত বিষ হয়।

জয়ার ভাগ্যে বিষ অমৃত হয়েছিল। প্রতিভার ভাগ্যে গোড়াতেই উঠেছিল বিষ। সেটা হয়ত উঠেছিল—তীব্র থেকে তীব্রতর। যে বিষ

আকণ্ঠ পান ক'রে—প্রেতিনী হয়ে উঠেছিল—তীব্রতর হয়ে উঠে তাকে ওই প্রেতিনী সত্তাতে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়েছিল সেদিন।

মজুমদার সাহেব তাকে চড় মেরেছিলেন। কারুর সাক্ষাতে মারেন নি। তবুও সেটা গোপন থাকেনি কারুর কাছে। মজুমদার সাহেব প্রতিভা কেউই কণ্ঠস্বর উচ্চ করতে দ্বিধা সংকোচ করেন নি। শেষ কটা কথা ব্যারাক পর্যন্ত এসে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

—আমি ওকে মা বলেছি প্রতিভা—ও আমার মা।

—তোমার অনেক মা আমি দেখেছি—শেষ পর্যন্ত—

এবার ঠাস ক'রে চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন মজুমদার সাহেব। এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাঁর মোটর বেরিয়ে গিয়েছিল আশ্রম থেকে।

সেদিন নিজেকে নিরাপদ বোধ ক'রে সে ভগবানকে ডেকে রাত্রে অনেক কেঁদেছিল। ভগবান কিন্তু একদিকে নিরাপদ করে অন্য দিকে তার বিপদ এনে দিলেন। কিম্বা হয়তো তার ভাগ্য। ভগবান করলেন নিরাপদ। ভাগ্য আবার ডেকে আনলে বিপদ। এ না মানলে বলতে হয় সংসারের কাঁটা ছড়ানো প্রান্তরে যে হাঁটে তার সামনের কাঁটা গাছটা কেটে দিলেও সে নিরাপদ হয় না—কাঁটা মাটির সঙ্গে মিশে জড়িয়ে আছে। পায়ে সে ফোটেই।

বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচলেও নেকড়ে শেয়াল অসংখ্য।

আশ্রমের চারিপাশে স্থানীয় গ্রামগুলির প্রমত্ত নব যুবক দলের শিস্ গান ছুঁড়ে মারা অশ্লীল রসিকতা বাড়তে লাগল। ক্রমে ঢেলায় বাঁধা চিঠি এসে পড়তে লাগল ওখানে।

এবার তাকে বাঁচালেন মজুমদার সাহেব। জয়া কলকাতায় চিঠি লিখলে। তার সন্দেহ হয়েছিল প্রতিভাকে। সেই ওদের উস্কে দিয়ে করাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল তার। মজুমদার সাহেব এসে পুলিশে খবর দিয়ে তাদের শাসন করলেন।

জয়া তাঁকে মিনতি ক'রে বললে—বাবা আমাকে এখান থেকে কলকাতার আশ্রমে নিয়ে চলুন। এখানে থাকলে হয়তো আমি ম'রে যাব।

মজুমদার সাহেব একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—না—সেটা হয় না জয়া। কলকাতার আশ্রমে—।

না—না—না ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে সেটা শুধু জয়াকেই বলেন নি, নিজেকেও বোধ হয় বলেছিলেন।

তিনি সুরমাকে ভয় করেছিলেন—না—নিজেকে ভয় করেছিলেন সে কথা জয়া জানে না।

প্রশ্নটা তার অর্থাৎ জয়ার নয়। প্রশ্নটা আমার।

মজুমদার সাহেব বলেছিলেন—আমি ভাবছি জয়া—আমি তোমাকে কোন স্কুলে ভর্তি ক'রে দেব। বোর্ডিং-এ থাকবে। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার অনুরাগ আছে, ঐকান্তিকতা আছে—তুমি পাস করতে পারবে। তুমি যতদূর পড়তে পাব—আমি তোমাকে পড়াব। এম-এ পাশ ক'রে নেবে। তোমার এখানে থাকার বিপদ বুঝি। এখানে তোমাকে রাখব না। আমার গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়—এখন এম-ই। হাইস্কুল এখনও হয়নি, হ'লে আজই পাঠিয়ে দিতাম। তুমি ভয় পেয়ো না!

সেদিন সৌভাগ্যের উঁকি মারা প্রসন্ন হাস্যময় মুখ দেখে জয়া অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এত সৌভাগ্য হবে তার। সে কল্পনা করেছিল অনেক রকম। শেষে ভেবে চিন্তে স্থির করেছিল—না, কলেজে সে পড়তে যাবে না। ম্যাট্রিক পাশ করে সে কোন গার্লস স্কুলে চাকরি ঠিক করে নেবে। সেখানে সে ভাইকে নিয়ে যাবে। কাজ করতে করতেই নিজে পড়বে—ভাইকে পড়াবে।

সে জানে ভাইয়ের অশান্তপনা সে তার জন্যই। তারই জন্য সে এমন হয়ে গেছে। তার কাছে এলেই সে বদলাবে। মজুমদার সাহেবকেই বলবে—তাঁর গ্রামের স্কুলেই চাকরির জন্য। তিনি দেবেন—সে নিশ্চয়, নিশ্চয় পাবে।

এই পড়তে পড়তে সে আই-এ দেবে বি-এ দেবে।

ভাই ম্যাট্রিক দেবে। একবারে না পারে ছ বার তিনবার চারবারে তাকে পাশ করতেই হবে। তাদের বংশে—তার ঠাকুরদার সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বাপের আমল থেকে বাপ কাকা এরা বিদ্যার চর্চা করে এসেছেন। তাঁরা দুইজনেই শিক্ষক ছিলেন। তারা তাদের সন্তান—তারাও তাই করবে।

তার জীবনের ছন্দে এ পর্যন্ত ছিল একটি বিষণ্ণ ধীরতা। সে চলত ধীরে—কথা বলত মিষ্ট মৃদু স্বরে—অবসর সময়ে বসে থাকত শান্ত ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে—ভাবত—। ভাবত হয় ভাইয়েব কথা নয়তো পাগল কাকার কথা। আজও তিনি অর্ধ পাগল। উন্মাদ পাগলামি কমে এসেছে। এখনও অসংলগ্ন কথা বলেন। থাকেন সন্ন্যাসীর মত। গেরুয়া পরেন। ঘোরেন এখানে ওখানে। কাকীমা সেই গেছেন বাপের বাড়ি আর কাকাও তাকে আনেন নি—তিনিও আসেন নি। কোন কোন দিন ভাবে বাল্যকালের কথা। বাবা মা, ঘর, সে পূর্ববঙ্গের গ্রামের ঘর-নদী-বাগান। সে সব খুব আবছা মনে পড়ে। ঝাপসা ছবির মত। দেশ ভাগের পর বাবার তৈরী করা নতুন বাড়ির কথা মনে পড়ে। টিনের চাল, মাটির দেওয়াল। কয়েকটা ছোট ছোট গাছ উঠানে। গ্রামটা তাদের ছিল—কেবল মাত্র এদেশে আসা পূর্ববঙ্গের লোকদের; একখানা বড় গ্রাম থেকে একটু সরে—একটা জঙ্গলের মত জায়গা পরিষ্কার করে গ্রামখানা হয়েছিল। চারিপাশে গ্রামের চারিদিকে বড় বড় গাছের ছবি স্পষ্ট মনে আছে তার। বাবা দোকান করেছিলেন একটা—যে দোকান ফেল পড়ে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে উপবাস অর্ধ-উপবাসে বছর খানেক কাটিয়ে টি. বি. তে পড়েছিলেন। মনে পড়ে রুগ্ন বাবাকে। সেই তাঁর সেবা করত, তিনি কাঁপতেন—কাতরাতেন, শেষের দিকে কাশলে তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত বের হত। এক একদিন ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তবে কাশি থামত। সেই একটা মাটির গামলা তুলে তাঁর মুখের কাছে

ধরত। মায়ের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। এক একদিন এক একটা স্মৃতির টুকরো ঘিরে তার চিন্তা ঘুরত। কোন কোনদিন একটার পর একটায় যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলত—পরিক্রমা করে আসত সেই পূর্ববঙ্গ থেকে আজ পর্যন্ত।

সেই জীবনের ছন্দে—অবকাশ সময়ের চিন্তায় একটা বদল হয়ে গেল—মজুমদার সাহেব—না তিনি অন্যের কাছে যাই হোন, অন্যে তাঁকে যাই বলুক, এখন ভাল মন্দ দু'দিক বিচার করে জ্ঞানী লোকে বিচারকে যে রায়ই দিন তাঁর সম্পর্কে—সে তাঁকে বাবাই বলবে; তার বাবার তুল্য—মজুমদার সাহেব তার জীবনের ছন্দ পাল্টে দিয়ে গেলেন; তার দুর্ভাগ্যের যবনিকা সরিয়ে সৌভাগ্যের উঁকিমারা মুখ তাকে দেখিয়েছেন—তীর থেকে অন্ধকার পথে পড়েছে আলোর ছটা।

সে হাসতে লাগল। উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে লাগল। বয়স্কা মেয়েদের মধ্যে যাদের কিছু বয়স কম তাদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে গান গাইলে। মধ্যে মধ্যে সে ছুটত। সব থেকে হুল্লোড় করত স্নানের সময়। সাঁতার কাটত। সাঁতার কেটেছিল সে সেই ছ-সাত বছর বয়সে। এদেশে এসে তারা যে বাড়ি করেছিল। সেখানকার পুকুরে আবার তার শখ হল সে নতুন করে সাঁতার কাটা শিখবে। ঘণ্টা খানেকেরও বেশী সে সাঁতার দিতে লাগল। দিন পনেরোর মধ্যে মোটামুটি পোক্ত হয়ে উঠল সে সাঁতারে। একটা কলসী নিত—সঙ্গে। সেটাকে ভাসিয়ে—হাতে করে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে দিয়ে—সাঁতার দিয়ে চলত। ক্লান্তি হলে কলসীটাকে করত আশ্রয়।

ভোলাদাসী একদিন বললে—তুই ভাই জিতলি জয়া।

কথাটা বোঝেনি জয়া; সে বললে—কেন ভোলাদি?

—তোকে একদিন বলেছিলাম—মনে আছে তোর? শুচিবাই?

হেসে জয়া বলেছিল—তা আছে। কিন্তু এতে হার জিৎ কোথা ভোলাদি?

—নেই। আমি ভেবেছিলাম রে—যতই শুচিবাই তুই মনে মনে

পুষিস পরিত্রাণ তুই পাবি নে। পাপ তোকে ছাড়বে না। বুড়ো তোকে সত্যিই মা বলে নিয়েছে রে। সেদিন মানে প্রথমদিনও ভেবেছিলাম—এ ওর ভাঁওতা। ওরা যে সব পারে! মুখে মা বোন দিদি মেয়ে বলেও—সব পারে। কিন্তু না। মনে হচ্ছে সত্যিই।

জয়া তার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—এই জন্যেই তোমাকে আমি খুব ভালবাসি। তুমি ভুল হলে স্বীকার কর। যখন ভগবানকে মুখ পোড়া বলে গাল দাও তখন ঠিক বুঝতে পারি এক সময় না এক সময় মনে মনে প্রণাম ক'রে বলবে ভুল করেছি, দোষ হয়েছে ঠাকুর, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তোমাকে আমার কেমন লাগে জান!

— কেমন?

—জনার বিদূষকের মত। কাকার কাছে কলকাতায় ছিলাম—তখন পুজোতে যাত্রা হত। জনা নাটকে বিদূষক ছিল—সে কিছুতেই হরির নাম করত না। লোকে মনে করত লোকটা পাষণ্ড। কিন্তু সে খুব ভক্ত ছিল—জানত যে হরির নাম একবার করলেই 'বল হরি' হয়ে যাবে—হরি এসে তাকে নিয়ে চলে যাবেন রথে চড়িয়ে।

ভোলাদাসী হেসেছিল—বলেছিল—বেশ ভাই তুই ম্যাট্রিক পাশ করে চাকরি যখন পাবি—তখন যেন আমাকে নিয়ে যাস। তোর রান্না-বান্না কাজ কর্ম করতে তো একটা লোক লাগবে।

—নিশ্চয় যাব। নিশ্চয়। নিশ্চয়।

—একটা গাই কিনিস। গাই আমি খুব ভালবাসি—যত্ন করতে পারি—খুব ভাল হবে, বাড়িতে দুধ পাবি। গোবর থেকে ঘুঁটে দেব।

—দূর! গরু রাখলে গাছপালা হবে না ভোলাদি—মুড়িয়ে খেয়ে দেবে। আর ঘুঁটে কোথায় দেবে? সে সব ইস্কুলের কোয়ার্টার তাতে ঘুঁটে দিলে খারাপ হবে যে—আর দিতেই বা দেবে কেন? তার থেকে তুমি আমি আমার ভাই মিলে বাগান করব। শাক সব্জী লাগাব।

—দূর—দুধের তুল্য জিনিস আছে। তাও ঘরের দুধ। ছেলে পিলে হলে বুঝবি। তখন গোয়ালার জল দুধ খাওয়াবি আর আপশোষ

করবি।

লাবণ্য এসে পড়ায় ওকথায় ছেদ পড়েছিল। লাবণ্যই কথা বলে ঘরে ঢুকে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

—কি চিঠি এসেছে জয়া। মুখখানা হাঁড়ি হয়ে উঠেছে।

অর্থাৎ প্রতিভাদির মুখখানা হাঁড়ি হয়েছে।

জয়া উঠে বসেছিল। তার মনে হয়েছিল—নিশ্চয় চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে—মজুমদার সাহেব লিখেছেন—জয়াকে ভর্তি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে বলিবে। আমি গিয়া তাহাকে আসানসোলে ভর্তি করিয়া দিব।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—দাঁড়াও আমি যাই আপিসে কোন ছুতো ক'রে। দেখে আসি কি ব্যাপার।

—তোকে বলবে মনে করেছিস?

—দেখি না। কি বলে। তুটো কড়া কথাও তো বলবে।

প্রতিভাদি সত্যিই খুব গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। জয়া যেতেই সে খ্যাঁক করে উঠেছিল। বলেছিল—কি, কি চাই তোমার?

জয়া মনে মনে ঠিক করেই গিয়েছিল উত্তরটা। বলেছিল ভাইটার কোন চিঠি পাইনি অনেকদিন—তাই দেখতে এসেছি কোন চিঠি এসেছে কিনা।

—না। আসেনি।

জয়া তবু নড়েনি। সামনের বেঞ্চে বসেছিল।—বাবা কোন চিঠি দেননি?

—বাবা? তোমার সাতপুরুষের বাবা! বাবা দার্জিলিং যাচ্ছেন সুরমাকে নিয়ে। এদের মত শয়তান বদমাস আর তুনিয়ায় নেই। বুঝলে। তুনিয়ায় নেই। তাঁরা চললেন দার্জিলিং। আশ্বিন মাসে দার্জিলিংয়ে বেড়াবেন। কাঞ্চনজংঘা দেখবেন।

জয়া আর হাসি চাপতে পারছিল না; সে আস্তে আস্তে উঠে চলে

আসছিল—হঠাৎ চোখে পড়েছিল একখানা পোষ্ট কার্ড বেঞ্চের তলায় পড়ে আছে। সে হেঁট হয়ে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ঠিকানাটা দেখেছিল। সুন্দর মেয়েলি হস্তাক্ষরে লেখা–শ্রীমতী প্রতিভা দেবী মাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণেষু।

প্রতিভাদির মেয়ে আছে সে শুনেছিল। প্রতিভাদি অবশ্য নাম তার কালে-কস্মিনে এক আধবার করে। চিঠি-পত্র সে দেয়ও না—মেয়েও খুব কম লেখে। মজুমদার সাহেবই তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটি নাকি ভাল। সে মজুমদারের স্কুলেই মাষ্টার। মেয়েটির হাতের লেখাটি তো সুন্দর!

চিঠিখানা তুলে টেবিলের উপর রেখে জয়া বলেছিল—আপনার মেয়ের চিঠি না প্রতিভাদি?

—ও—হ্যাঁ। দাও—

—টেবিলের তলায় পড়ে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—হাতের লেখাটি তো খুব সুন্দর! চমৎকার!

একটু হাসলে প্রতিভাদি। বললে—হ্যাঁ। বুদ্ধিও ওর খুব ছিল। খুব বুদ্ধি কিন্তু। একটু চুপ করে থেকে বললে—দশ বছর বয়সে ওর বাবা মারা গেল। এগার বছব বয়সে–আবাব একটু থেমে বললে,—পেটেব দায়ে চাকরি নিলাম—কলঙ্ক হল। মজুমদার সাহেব গ্রামের লোক গ্রামে গেলেন—তিনি চাকরি দিলেন ওঁর দেশের বাড়িতে। তারপর।—হেসে বললেন—তারপব সাহেবের সেবা করতে কলকাতা আসতে হবে বললেন। বুঝতে পার তো। বয়স তো হয়েছে। বললাম–মেয়ের কি হবে? এরপর তো আর ওর বিয়ে হবে না। আপনি বিয়ে করেন নি—আপনার সেবা করব। লোকে কি কেউ বিয়ে করবে ওকে? উনি দেখে শুনে একটি ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছেলেটি ভাল। চাকরি করতে করতে বি-এ পাশ করেছে। তারই খবরটা দিয়েছে। আমি তো লজ্জায় চিঠি তাকে

লিখি নে। পড় না চিঠিখানা পড়।

জয়া পড়ছিল চিঠিখানা। সুন্দর হাতের লেখা। বানান ভুল নেই। তার নিজের লেখায় অনেক বানান ভুল আছে। স্বামীর পাশের খবর দিয়েছে—ছেলে-মেয়ের খবর দিয়েছে। গ্রামের কথা লিখেছে। এবার ধান ভাল—সে খবর দিতেও ভোলেনি।

চিঠিখানা নামিয়ে দিয়েছিল সে টেবিলের উপর। বলেছিল—সুন্দর চিঠি। লেখাপড়াও তো ভালো শিখেছেন। একটি বানান ভুল নেই।

—পড়তে পেলে—ও বি-এ, এম-এ পাশ করত। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—মজুমদার সাহেব আমাকে বলেছিলেন—ওকে নিয়ে চল সঙ্গে—স্কুলে পড়বে, বোর্ডিংয়ে থাকবে। কিন্তু আমিই তা দিইনি। আমি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম। বোঝা নামাতে চেয়েছিলাম ঘাড় থেকে। তাছাড়া—তাছাডা ভেবেছিলাম—মেয়ে লেখাপডা শিখবে—আমাকে ঘেন্না করবে। আমার জন্যে লজ্জা পাবে। তার থেকে বিয়েই ভাল। তা ভালই হয়েছে। ও—ওর বাপের মত। বাপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ ছিল—অল্পতেই খুশী হত। ঠিক তার মত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—হ্যাঁ, ভালই হয়েছে। সে সুখেই আছে। আমার মত রাক্ষসী তো নয়। আমার ভয়ঙ্কর ক্ষিদে জয়া। সময় সময় নিজেকেই আমার ভয় করে।

আরও খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলেছিল—কিছু দিন আমি সুখী হয়েছিলাম—ওর দাসীবৃত্তি ক'রে। কিন্তু, ওই সুরমা এসে আমার কপাল পুড়িয়ে দিলে। অনাথা আশ্রম করে ওকে রাণীর হালে রাখলে—আমি ক্ষেপে গেলাম। দিনরাত ঝগড়া করতাম। শেষে এখানে এই আশ্রম ক'রে আমাকে রাখলে। নির্বাসনে দিলে।

একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললে প্রতিভা। সাধারণ দীর্ঘ নিশ্বাস থেকেও সে নিশ্বাস আরও দীর্ঘ, হয়তো আরও অনেক উত্তপ্ত। ফেলে তিনি বললেন—ভারী মিষ্টি করে বললেন—বস তুমি।

জয়া দাঁড়িয়েই শুনছিল। বসবার যেন অবসর হয়নি। সে প্রায়

অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। অকস্মাৎ এ কি হল? প্রতিভাদি তার কাছে তার অন্তর উজাড় করে সমস্ত দুঃখ ক্ষোভ ঢেলে দিচ্ছেন। একান্ত আপনজনের মত তাকে বলছেন—বস তুমি। অর্থাৎ এখনও কথা শেষ হয়নি। কথা বলে আশ মেটেনি। সে বসেছিল।

তারপর কিন্তু কথা হাবিয়ে গিয়েছিল। দু'জনেই চুপচাপ বসেছিল অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ।

জয়ার চিঠিতে রয়েছে"তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিলাম। প্রতিভাদিদিব দুঃখে মন আমার ভারী উদাস হইয়া গেল। তাহাকে খুব ভাল লাগিতেছিল। এতদিন তিনি যে সব মন্দ কথা বলিয়াছেন —তাহা সব ভুলিয়া গেলাম। কি বলিয়া সে কথা তাহাকে জানাইব তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কতক্ষণ পর প্রতিভাদিদি বললেন— তোমার ভাগ্য ভাল জয়া। লোকটা তোমার উপর পাপ দৃষ্টি দেয় নাই। যদি স্কুলে ভর্তি করিায় দেয়—তবে—ভাল করিয়া পড়িয়া পাশ করিও। চাকরি করিয়া আপনার পায়ে দাঁড়াইয়ো। কিন্তু খবরদার এ লোকটা হইতে অনেক দূরে—অনেক দূরে। ইহাদের মতি যে কখন চঞ্চল হয়, পরিবর্তন হয় তার ঠিক নাই। এটা জানিয়ো আমি আর বাধা দিব না। আমিও তাহাকে তাগাদা দিব সত্বর তোমাকে স্কুলে ভর্তি কবিয়া দিতে। এখানকার কাছে কোন স্কুলে ভর্তি হইও। মধ্যে মধ্যে এখানে আসিবে। আমি তোমাকে সত্যিই দিদির মত আদর করিব। যাও। দেখ গাছে জল দিবার সময় হইয়াছে।"

জয়া লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে এসেছিল—আনন্দে ভরপুর হয়ে। প্রতিভাদি'ও তাকে ভালবেসেছেন। আর কোন শত্রুতা নেই তার সঙ্গে। পৃথিবীতে আজ তার কেউ শত্রু নয়। বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে ছুটতে ছুটতে এসে উঠেছিল এ ব্যারাকে। লাবণ্য ভোলাদাসী উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—কি রে? কি হল?

জয়া হাসিমুখে বলেছিল—সে অনেক কথা। বলব—সন্ধ্যের পব আমার ঘরে—চুপি চুপি বলব।

—কবে যাবি তুই?

—তা জানি না।

—তবে?

—তবে সে অনেক কথা। এখন চল। গাছে জল—গাছে জল—গাছে জল। কোমর বাঁধো জল তোল। ছোটো।

—মর' যা—

—তাই বটে। কিন্তু চল।

—না বললে যাব না।

—প্রতিভাদির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল।

—ভাব হয়ে গেল কি?

—ভাব হয়ে গেল, ভাব হয়ে গেল এতে আবার কি কিসের?

—মুখটা হাঁড়ি হয়েছিল কেন? কি চিঠি এসেছে?

—সাহেব সুরমাদি দার্জিলিং যাচ্ছেন এখন কিছুদিন আসতে পারবেন না।

প্রথম খিলখিল করে হেসে উঠেছিল ভোলাদাসী—তারপর তার সঙ্গে লাবণ্য। ও মাঃ—তাই।

হিংসেতে ফেটে যাচ্ছেন! হি-হি-হি-হি-হি।

—না,হেসো না এমন করে ভোলাদি। পরের দুঃখে হাসতে নেই। চল, বেলা গেল, চল জল দিতে হবে। ক'দিন বৃষ্টি হয়নি। গাছের গোড়াগুলো কাঠ হয়ে গেছে শুকিয়ে।

পুকুর থেকে বালতি করে জল তোলা। ঘাট থেকে লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েরা দু'সার হয়ে। একদিকে খালি বালতি গেল ঘাটে অন্য দিক দিয়ে হাতে হাতে জলভর্তি বালতি এল বাগানে।

মধ্যে মধ্যে দিক বদল। খালি বালতির দিক দিয়ে আসতে লাগল ভর্তি বালতি।

এ নিয়ে ঝগড়া বাধে। বাধে জল ভর্তি বালতি বইবার বারের সংখ্যা নিয়ে। আজ ঝগড়া বাধল না। এই ঝগড়ার জন্যে ঘাটে নিজে থাকে জয়া। সে ঠিক ঠিক ভর্তি বালতি ধরিয়ে দেয়—একবার এদিক একবার ওদিক।

জল দেওয়া শেষ করে জয়া ঘাটে নামল—গা ধুতে। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরা। সন্ধ্যের সময় গা ধোয়ার পর্ব স্নানের পর্বের মত নয়, অল্পেই সারে। কিন্তু জয়া কোমর বেঁধে কাপড় সামলে ভেসে পড়ল জলে। মাথার চুল ভিজে গেল।

ভোলাদাসী বললে—ও কি? এই সন্ধ্যেবেলা মাথা ভিজুচ্ছিস কেন?

—শরীরটা আনচান করছে ভোলাদি! জলে গা ডুবিয়ে শরীরটা জুড়লো। বলে সে এগিয়ে চলল মাঝ জলের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য।

মন ছিল হাল্কা হয়ে—তোলপাড় করলে জল।

প্রতিভা এসে দাঁড়িয়ে ডাকলে—জয়া এ কি করছ? উঠে এস। জয়া!

জয়াকে ঠেলে দিলে লাবণ্য। জয়া চিৎ সাঁতার দিচ্ছিল—ডুবে গেল। মুহূর্তে ঘুরে উঠল কিন্তু জল খেলে। কাশতে লাগল।

লাবণ্য বললে—প্রতিভাদি। ডাকছে। তাই ঠেলে দিলাম।

ওরা ফিরল। কাশতে কাশতেই ফিরছিল জয়া। বুকে একটা ব্যথা লাগছিল। খুব দূরে তারা যায়নি, এসে ঘাটে উঠল। কিন্তু জয়া তখনও কাশি সামলাতে পারেনি। নিষ্ঠুর ভাবে কাশছে।

দাঁড়িয়েও সে বুকে হাত দিয়ে কাশছিল।

প্রতিভা বললে—কি হল?

—জল খেয়ে কাশছে প্রতিভাদি!

—উঠে এস। ধর ওকে!

হঠাৎ মুখের ভিতরটা গরম হয়ে গেল জয়ার। বিস্বাদ হয়ে গেল। ঠোঁট বেয়ে বেরিয়ে এল কিছু। জয়া বুঝতে পারেনি। কিন্তু লাবণ্য চীৎকার করে উঠল—ও মা!

—কি? প্রতিভা প্রশ্ন করলে।

—রক্ত!

জয়া এবার দেখলে তার বুকের কাপড়ে মুখ থেকে নির্গত গরম বস্তুটা পড়ে লালচে করে দিয়েছে। রক্ত!

প্রতিভা শঙ্কিত কণ্ঠে বললে, সে কি? রক্ত?

জয়া থর থর করে কাঁপছিল। বুকের কাপড়টায় লাল রক্ত মুখ থেকে কাশতে কাশতে রক্ত পড়ছে। মনে পড়ল বাবার কথা! বাবা তার বুকে হাত দিয়ে কাশত; কাশি সহজে থামত না। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে থামত। মারও তাই।

টি-বি। যক্ষ্মা রোগ। সাক্ষাৎ মৃত্যু।

তারও হ'ল!

সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেছে। পশ্চিম দিকে কালো বনের রেখার উপর শুধু একটা লম্বা লালচে রঙ টেনে দিয়েছে।

জয়ার রক্ত কি ওখান পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে লেগেছে?

না। যক্ষ্মা নয়। জয়ার যক্ষ্মা তখনও হয়নি! জয়া কলকাতায় এল। পরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠালে তাকে প্রতিভা। সেই তাকে সাহস দিলে ভয় নেই, এখানকার ডাক্তার যা বলেছে তাই সত্যি দেখবে। গলা চিরে রক্ত পড়েছে। জল খেয়ে ফেলেছ, বেশী গলা চিরে গেছে। হয় তো বা ছোট শিরা ছিঁড়ে গিয়েছিল। কই তারপর তো আর পড়েনি!

কলকাতার আশ্রমে এসে একমাস সে স্বতন্ত্র একখানা ঘরে পড়ে রইল। মজুমদার সাহেব সুরমা দেবী দার্জিলিংয়ে—তাঁদের চিঠি লেখা

হয়েছে।

বহু কষ্টে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। ভাই অনেক বড় হয়েছে। তের চৌদ্দ বছর বয়স। শরীর তার সবল। দু'জনে কাঁদলে।

জয়াই প্রথম আত্মসম্বরণ ক'রে বললে—কাঁদিসনে আমার কিছু হয় নি। তুই দেখিস। কিন্তু তুই ভালো ছেলে হ। পড় ভাল ক'রে। আমি এবার স্কুলে ভর্তি হব। পাশ করব। দেখিস তুই। তারপর মাষ্টারি নিয়ে—দেখবি তোকে নিয়ে যাব। তুইও পাশ করবি কলেজে পড়বি! দেখিস।

একমাস পরে ফিরে এলেন মজুমদার সাহেব আর সুরমা দেবী। দুজনে পরদিন একসঙ্গেই জয়াকে দেখতে এলেন। মজুমদার সাহেব চিন্তিত ভাবে বললেন, রক্ত পড়েছে গলা দিয়ে?

জয়া বললে—হ্যাঁ।

সুরমা দেবী বললেন—সে সত্ত্বেও আশ্রমে ওকে রাখা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। অত্যন্ত অন্যায়! আমি তোমাকে বারবার বলেছিলাম লিখে দাও ওকে অন্য কোথাও রাখতে।

—অন্য কোথায়? জায়গাতো চাই!

—সে তুমি দয়ার সাগর—তুমি বুঝবে! এখানকার চার্জ আমার। এখানে এতগুলো ছেলে মেয়ে। কলকাতা শহর। আর ওই ব্যাধি। সেখানে রাখলে কি হ'ত? প্রতিভা এখানে পাঠিয়ে নিজের দায় ঝেড়ে ফেলেছে। আমি এর জন্যে তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইব। আর যত সব কুড়োনো মেয়ে নিয়ে তোমার ন্যাকরা। তিনি চলে গেলেন।

জয়া অবাক হয়ে দেখলে প্রতিভার প্রেতিনীটা সুরমার মধ্যে থেকে দাঁত বের ক'রে তাকে শাসাচ্ছে।

মজুমদার সাহেব বললেন, ভেবোনা তুমি। কালই ডাক্তার ডেকে তোমাকে দেখাবার ব্যবস্থা করছি। ভেবো না। তিনিও চলে গেলেন।

ভেবোনা! বললেই না ভেবে পারে? জয়ার তরুণ জীবনে তখন অনেক আশা, মনে তার অনেক বল সব যে রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে,

ডুবে যাচ্ছে! সারারাত সে ঘুমোয়নি সেদিন। কাল ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা হবে।

হ'ল সব। ডাক্তার দেখলেন। একস্‌রে হল। থুথু গয়ের পরীক্ষা হল। রায় এল—না টি.বি.র কোন লক্ষণ ধরা পড়ে নি। টি. বি নয়।

আনন্দে অধীর হয়ে গিয়েছিল সে।

জীবনী সমেত জয়ার চিঠিখানায় সে লিখেছে—যেদিন জানিলাম আমার টি. বি. হয় নাই সেই আনন্দের দিন আবার আমার ছুটিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হইয়াছিল—। যে পাঁচিলটা আমাদের অর্থাৎ বয়স্কা মেয়েদের ও ছেলেদের আশ্রমের মাঝখানে সেখানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—"ওরে দীপু টি. বি. হয় নাই। আমার টি. বি. হয় নাই, আমার টি. বি. হয় নাই। সে দিনটির কথা মনে হইলে আজও মনে হয়, না—না—এ আমার টি. বি নহে। এখানকার ডাক্তারেরা বুঝিতে পারিতেছে না।"

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘরের জানালায় ঠুকঠুক শব্দ শুনে চমকে উঠেছিল জয়া। সেদিনও তার ঘুম হয়নি। আনন্দে ঘুম হয়নি। সে ভবিষ্যতের কল্পনায় বিভোর ছিল। রাত্রি তখন অনেক। হঠাৎ তার ওই একক ঘরখানার পিছন দিকের জানালায় ঠুক ঠুক শব্দ উঠল। ঘরখানা ছোঁয়াচে রোগের রোগীকে রাখবার জন্যেই তৈরী। পিছন দিকটায় খানিকটা গাছপালা, তার ওপারেই ছেলেমেয়েদের সীমানার পাঁচিল। সে চমকে উঠল। প্রথমেই ইচ্ছে হ'ল চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু ভয় হল। একটা কেমন ভয়। কে? কে? একলা যুবতী মেয়ে সে ঘরে শুয়ে আছে। তার পিছনের জানালায় তাকে ডাকছে—সে যদি বলে—। বলে যে তার ডাকবার কথা ছিল!

জয়া লিখছে—বিচিত্র মানুষের মন। মনে হল যদি—মজুমদার সাহেব হন! সঙ্গে সঙ্গে ছি-ছি করেছিল নিজেকে। তারপরই মনে

হয়েছিল দীপু নয় তো? দুর্দান্ত অশান্ত দীপু! সে তো খবর পেয়েছে এক্সরে হচ্ছে, অন্য পরীক্ষা হচ্ছে।

সে এবার জানালার ধারে গিয়ে মৃদুস্বরে বলেছিল—কে?

—আমি দীপু।

জানালা খুলে জয়া বলেছিল, কি করে এলি তুই?

—পাঁচিল ডিঙিয়ে!

—তুই ডাকাত হবি রে। তুই ডাকাত। ভিতরে আয়।

—না। যাব না। এখুনি পালাব। তোমার খবর পেয়েছ? এক্সরেতে কিছু নাকি পায়নি?

—হ্যাঁরে। কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। বলেছিলাম তোকে। কিচ্ছু হয়নি আমার! কিচ্ছু না। একটু একটু কাছে আয়। আর একটু।

জয়া দীপুর চিবুকে হাত ঠেকিয়ে—সেই হাত ঠোঁটে ঠেকিয়ে তাকে চুমু খেয়েছিল। বলেছিল—চলে যা এবার। দেখ, এবার আমি বোর্ডিংয়ে চলে যাব—তুই কিন্তু ভাল ছেলে হ'স। কেমন। হ্যাঁ, পাশ করে চাকরি পেলেই তোকে নিয়ে আসব।

দীপু অবলীলাক্রমে একটা গাছে উঠে—সেই গাছ থেকে পাঁচিলের উপর সুন্দর কৌশলে ঝুলে নেমে পড়ে—ওপারে লাফিয়ে পড়েছিল—একটি শব্দ উঠেছিল শুধু—ঝুপ!—কি ডাকাত ছেলে! প্রসন্ন আনন্দে তার মন ভরে উঠেছিল।

কবে তাকে বোর্ডিং পাঠানো হবে—স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে—তার জন্যই সে উদগ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা ক'রেছিল। আর ভাবছিল তার ভবিষ্যতের কথা। বেশ লাগছিল তার। হঠাৎ একদিন তার ডাক পড়ল আপিসে—সুরমা দেবীর কাছে। সুরমা দেবী একা ছিলেন।

গম্ভীরভাবে সুরমা দেবী বললেন—দেখ, মেদিনীপুরে একটি মহিলা সমিতির জন্যে একজন টীচার দরকার। আমার চেনা একজন বন্ধু

আমাকে বলছিলেন। সেলাই শেখাতে হবে—উল বোনা শেখাবে, আর যতটা পারবে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পড়াতে হবে। আমার মনে পড়ল তোমার কথা। তাঁকে বলেছি আমি তোমার কথা। তিনি তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। তুমি চলে যাও সেখানে। মাইনে পাবে তিরিশ টাকা। সমিতির ঘরে থাকবে। বুঝেছ!

মহিলা সমিতি? উল বোনা সেলাই শেখাতে হবে। প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পড়াতে হবে? স্কুল নয় বোর্ডিং নয়? সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। স্তম্ভিত, হ্যাঁ সে স্তম্ভিতই হয়ে গিয়েছিল!

—শুনলে কথা? তোমাকে আজই যেতে হবে!

জয়া বললে—বাবা—

—কে বাবা? বাবা কে?

—সাহেব—

—হ্যাঁ—তাই বল।

—উনি বলেছিলেন—

—কি বলেছিলেন—

—বলেছিলেন আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

—স্কুলে ভর্তি করে দেবেন—বোর্ডিংয়ে রাখবেন। মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা হাত খরচা দেবেন। কি ভাব কি তোমরা? যত সব কুড়োনো ভিখিরী—তাদের আস্কারা দিয়ে মাথায় তোলা। না সে সব হবে না। এত টাকা আমাদের নেই। তোমাকে একলা করলে তো চলবে না। করতে হলে সকলকে করতে হবে!

হঠাৎ মুখটা কাছে এনে মৃদু অথচ অতি নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললেন—কি করে এ সব কথা আদায় করেছ ওঁর কাছ থেকে? কি করে? বুঝেছ আমি বোকা?

জয়া পাথর হয়ে গিয়েছিল। স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিল পৃথিবী এত কদর্য!

—যাও। বিকেলে আমার সেই বন্ধুটি আসবেন—তোমাকে

দেখবেন। দেখে পছন্দ হলে নিয়ে যাবেন! মেদিনীপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। যাও।

জয়ার পত্রে রয়েছে—সেদিন সেই সময় মনে হয়েছিল কেন আমার টি. বি. হল না! সেই বেলাটা হতাশ হয়ে শুধু পড়েইছিলাম বিছানায়। খুলল না আমার ভাগ্যের বন্ধ দরজা, খুলেও খুলল না! হে ভগবান!

কাল—আর আজ। কাল টি. বি. হয়নি খবরটা পেয়ে পৃথিবীকে যত সুন্দর মনে হয়েছিল—আজ ওই সামান্য চাকরি নিয়ে যেতে হবে—হয় তো সারা জীবনই ওই আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে এই জেনে পৃথিবী যেন কালো হয়ে গেল।

আশ্রমের ঝি ছিল কামিনী! ষাঠ বছর বয়স—খুব পাকা পোক্ত। দরকার হলে অবাধ্য মেয়েদের সে মারত। চ্যাঙদোলা করে তুলে নিয়ে যেত। নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিত। সে এসেছিল কিছুক্ষণ পর। সে ঘরে ঢুকে বলেছিল—কাঁদছ না কি?

হেসে জয়া বলেছিল—না।

—বেশ। কাঁদবে কেন? তোমার ভাগ্যি এখান থেকে বেরুতে পারছ। ছাড়া পাচ্ছ। এরা ছেড়ে না দিলে তো কেউ ছাড়া পায় না। পালিয়ে গেলে হুলিয়া করে ধরে আনে। ছেড়ে দিচ্ছে—বেরিয়ে যাও, গিয়ে পথ করে নাও আপনার। পথ করবার এই সময়। বুঝেছ। যৌবন আছে। মোটামুটি ছিরি আছে। চলে যাও। মন চায় তো—।

একটা ঠিকানা দিয়ে বলেছিল—এই ঠিকানায় যেয়ে পদ্ম বাড়িউলি আছে। আমার নাম করো। সে তোমাকে যত্ন করে রাখবে। হিল্লে করে দেবে তোমার। বড় বড় লোক আসে সেখানে। বুঝেছ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়—

জয়া শিউরে উঠে বলেছিল—পায়ে পড়ি। কামিনী তোমার পায়ে পড়ি। ওসব বলো না—আমাকে ও সব বলো না।

কামিনী বলেছিল—ও মাঃ-গোঃ! একেবারে সতী লক্ষ্মী! শোন

বলে রাখলাম, যা মন চায় করো। পদ্মর ওখানে ফিলিমের বাবুরা আসে—নতুন মেয়ের খোঁজে। তোমার ভাগ্য যদি খোলে তবে লাখ টাকা রোজগার করবে। লোকে পাগল হবে—

জয়া উঠে বসে বলেছিল—না-না। ওসব তুমি বলো না। আমি বলে দেব।

—হেসে উঠেছিল কামিনী—বলে দেব? তবে তো আমার ফাঁসী হয়ে যাবে। আর বলব—তুমি বলেছ আমাকে। বলেছ—কামিনী তোমার যদি জানাশুনো কেউ থাকে—কোন বাড়িউলী যারা মেয়ে নিয়ে কারবার করে রাত্রে, ঘর ভাড়া দেয় তাদের ঠিকানা যদি দাও—তবে আমি চলে যাব সেখানে। তিরিশ টাকার চাকরিতে কি হবে আমার! আমি বলে দেব বলাতে তুমি আমার নামে লাগাচ্ছ!

জয়া নির্বাক হয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্তে। হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। হঠাৎ কামিনী ব্যস্ত হয়ে উঠে চলে গিয়েছিল অন্য দিকে। সুরমাদি তখন আশ্রম ঘুরতে বেরিয়েছেন। দূর থেকে দেখতে পেয়েছে কামিনী।

জয়ার পত্রে রয়েছে—সারা বেলাটা কথাটাকে মন থেকে দূর করতে পারিনি। ভনভনে নীলচে মাছির মত কথাটা এক ঝাঁক ওই মাছির মত মনের মধ্যে ভন্ ভন্ ভন্ করে উড়ছিল।

বিকেল তিনটের সময় তার আবার ডাক পড়েছিল আপিসে।

আপিসে সুরমাদির সামনে বসেছিলেন আর একটি মহিলা। প্রৌঢ়া, চোখে চশমা, পরনে সাদা খদ্দরের শাড়ী। সুরমাদি জয়াকে বলেছিলেন—

—প্রণাম কর। এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম।

প্রণাম করে মাথা তুলতেই—তিনি চশমার ভিতর দিয়ে জয়াকে দেখে বলেছিলেন—কি নাম তোমার?

—জয়া ব্যানার্জী।

—তোমার হাতের কাজ দেখলাম—ভাল। শুনলাম এদের নারী কল্যাণ কেন্দ্রে কাজও করেছ। ভাল কাজ করেছ। পাড়াগাঁয়েও ছিলে। তা হবে—একে দিয়ে না-হবার কোন কা'ণ দেখছি না। তুমি যাবে তো?

জয়া বললে—যাব।

তার মনের মধ্যে নতুন বিভীষিকা দেখা দিয়েছে।

কামিনী কুৎসিৎ নিষ্ঠুর হাসি হাসছে। সে জেনেছে এখানে থাকলে কামিনী তার পিছনে লাগবে। উত্যক্ত করবে। রাজী না হলে সেই তার নামে অভিযোগ আনবে—কুৎসিৎ অভিযোগ। অন্যদিকে সুরমা তাকে সন্দেহ করেছে। সে বললে—যাব।

—বেশ। যদি আজ যেতে পার তবে তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। না হলে—আমি ঠিকানা দিচ্ছি—তুমি চলে যাবে।

—আমি আজই যাব।

সুরমা বললেন—ওকে আমি বলে রেখেছি, ও তৈরী হয়েই আছে।

মেদিনীপুরে চন্দ্রকোণা।

সেখানে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন—তুমি ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী মশায়ের নাম করে চলে যাও। যে কোন রিক্সাওলা তোমাকে পৌঁছে দেবে। তিনি বিখ্যাত লোক। সারা জীবন দেশের সেবা করছেন। ভারতবর্ষের লোকও তাঁকে জানে। তাঁর স্ত্রী অরুণা চৌধুরী—তিনিও দেশের কাজ করেছেন—করছেন এখনও। এ সমিতি তাঁদের—তাঁকে চিঠিখানা দিয়ো। তিনি তোমাকে যেখানে কাজ সেখানে পাঠিয়ে দেবেন।

জয়ার পত্রে রয়েছে—পৃথিবীতে ভালো মানুষ আছে, দেবতার মত মানুষ আছে। চোখে দেখলাম।

পরিচয় নিয়ে কি সমাদর—স্নেহই করলেন। অরুণা দেবী আমার মা হয়ে গেলেন। তাঁকে মা বললাম। তাঁর কাছে যে স্নেহ পেলাম

তা মায়ের স্নেহের মতই। নিজের মায়ের স্নেহের সঙ্গে পার্থক্য কোন্ খানে জানেন? এ মায়ের বিচার বুদ্ধি বড়। নিজের মায়ের আবেগটা ছিল বড়। অনেক মানুষ দেখলাম। প্রথমেই বলেছি ভাল মন্দ সাধারণ তিন জাতের মানুষের কথা। এঁরা প্রথম জাতের অর্থাৎ খাঁটি ভাল জাতের মানুষ। তবে এঁদের খুব কাছে এগিয়ে যেতে ভয় করে —সে এঁদের দীপ্তি এবং ধার দেখে। ভাল বিচারের ধারাগুলি বড় ধারালো এবং সূক্ষ্ম। নিক্তির ওজন করে কার কি প্রাপ্য বিচার করে দিয়ে থাকেন। অনেকটা উঁচুতে থাকেন। মাটির মানুষের সঙ্গে মিশবার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে নেমে এসেও এঁরা মাথায় অনেক উঁচু হয়ে যান—মেশাটা হয় না। মাটির মানুষের তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বা মুখের দিকে তাকাতে ঘাড় বেঁকিয়ে উল্টো দিকে মাথা নিচু করতে হয়। তবু বলব—আমার এই ছোট জীবনে এমন বড় মানুষ আমি দেখিনি। আমার জন্যে অনেক করেছেন—সে কথা পরে বলছি; কিন্তু সেই জন্যেই বলছি না—বড় মানুষ; এঁরা সত্যিকারের বড় মানুষ। গান্ধীজীর শিষ্য। জীবনটা এঁদের তপস্যা। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। প্রথম যৌবনে এঁরা পরস্পরকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে বিবাহ করেন নি। দেশে স্বাধীনতা আসার পর যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে তার তিলক পরে প্রৌঢ় বয়সে বিয়ে করেছেন। কি যে ভাল আমার লেগেছিল এঁদের কি বলব। মনে হয়েছিল একদিন একরাত্রি এঁদের সঙ্গে বাস করে পবিত্র হয়ে গেলাম; জীবনে নতুন বল পেলাম। পরের দিন ওখান থেকে ছ সাত মাইল দূরে একখানি গ্রামে তাঁরা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই আমার কর্মস্থল। পথে যেতে যেতে সুরমাদি'কে আর সেই মহিলাটিকে (তাঁর নাম সুরমাদিও আমাকে বলেননি আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। অরুণা দেবী মাকে যে পত্র তিনি আমার হাতে দিয়েছিলেন খামে বন্ধ করে, সেখানেও পড়তে পাইনি।) ধন্যবাদ জানালাম। না হোক আমার স্কুলে ভর্তি হওয়া—না পাই আমি পাশ

করে বড় হওয়ার সুযোগ—আমি দেবতার মত মানুষের কাছে এসে পড়েছি, সৎসঙ্গের মহৎ আশ্রয়ের যদি কোন বাস্তব মূল্য নাও থাকে—তবু আমি পবিত্র হয়ে গেলাম ধন্য হয়ে গেলাম।

নতুন জায়গা, শান্ত পল্লীগ্রাম, সরল গ্রামের মানুষ। জয়া তার চিঠিতে লিখেছে 'বয়স্কা মেয়েরাও লজ্জাশীলা। এঁদের পড়ানো বড় শক্ত কাজ। বুঝতে না পাবলে বলেন না বুঝতে পারিনি।

—বুঝেছেন? জিজ্ঞাসা করলে ঘাড় নেড়ে জানান—হ্যাঁ।

—বলুন তো!

চুপ করে থাকেন। মুখ নামিয়ে নখে মেঝের মাটি খোঁটেন।

—তা হ'লে বুঝতে পারেন নি?

এবার 'না' ভঙ্গিতে ঘাড নেড়ে জানান—না বুঝতে পারেন নি।

আবার বোঝাতে হয় জয়াকে। ক্লান্তি বোধ হলেও ঝেড়ে ফেলে দেয়। বিরক্তি এলেও তাকে শাসন করে সরিয়ে দেয়।

এক বাড়িতে ছোট ছেলে মেয়ে পড়ানোর কাজও জুটেছিল তার। বিনিময়ে পেয়েছিল খাওয়া আর পেয়েছিল থাকার জায়গা।

মাসে মাসে মাইনের টাকা জমছিল। মাসে তিরিশ, বছরে তিনশো ষাট। তার মধ্যে নিজের কাপড় জামা ভাইয়ের জন্য কাপড় জামা কিনে পাঠানোর জন্য খরচ ঠিক করেছিল ষাট টাকা। বাকী তিনশো টাকা জমবে বছরে। বছর দুই গেলেই সে ভাইকে আনবে কাছে। নিজের পড়া হ'ল না ভাইকে পড়াবে।

মাঝে মাঝে অরুণা দেবী এসে তার কাজ দেখে যেতেন। কিছুদিন পর পর সে যেত তাঁর বাড়ি।

মা তাঁকে ভালবেসেছিলেন। সে ভালবাসা গাঢ় হয়েছিল। এক বছর পর আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে জয়ার কপাল খুলল।

মা অরুণা দেবী বললেন, জয়া আমি তোমার জন্যে ভাবছি কিছু দিন থেকে।

কথাটা বুঝতে পারেনি জয়া। চুপ ক'রে থেকেছিল। ভয় হয়েছিল হয় তো বা তার কোন অপরাধ হয়ে গেছে যার জন্যে তিনি চিন্তিত হয়েছেন, ভাবছেন এরপর কি ক'রে তাকে আর রাখবেন ?

অরুণা মা বুঝতে পারেননি তার সংশয়। তিনি বললেন, এই কাজ করছ এতে তোমার কি হবে ? কোন উন্নতির তো সম্ভাবনা নেই। সারা জীবনই এই সামান্য মাইনেতে পড়ে থাকতে হবে। তার থেকে তুমি এ চাকরি ছেড়ে দাও। এখন সরকার থেকে গ্রাম সেবিকা ট্রেনিং সেণ্টার খুলেছে সেই ট্রেনিং নাও। পাশ করলে চাকরি পাবে। মাইনে এর থেকে অনেক বেশী পাবে। তারপর হয়তো আরও রাস্তা খুলবে কে বলতে পারে ? কি বল ?

কি বলবে জয়া ? সে কেঁদে ফেলেছিল।

চাকরি ছেড়ে আসবার দিন—গ্রামের মেয়েরা তাকে অনেক আশীর্বাদ করেছিল। এক বৃদ্ধা বলেছিলেন—সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া অক্ষয় হোক মা—

তাঁর কথা তরুণীদের কলহাস্যে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ?

তিনি বলেছিলেন—মরণ, এতে হাসির কি পেলি ?

একজন মুখে কাপড় দিয়ে হাসি চাপা দিয়ে বলেছিল—জয়াদির যে বিয়েই হয়নি ঠাকুরমা !

বৃদ্ধা ঠকেন নি—বলেছিলেন—হয় নি, হবে। এমন মেয়ে কতজনা সেধে এসে বিয়ে করবে। বুঝলি ! ও কি তোদের মত বাপ মায়ের গলার কলসী। সেধে বর আসবে—সর্বাঙ্গে গয়না দিয়ে মুড়ে নিয়ে যাবে। ও রাজরাণী হবে। আমি বলে রাখলাম।

কথাটা সারারাস্তা গুঞ্জন করেছিল জয়ার বুকে। সে গুঞ্জনের মৃদু সঙ্গীত ঝঙ্কারে বিভোর হোয়ে সাত মাইল পথ বন্যার জল ভেঙে এসেছিল মায়ের ওখানে—একবারের জন্যও ক্লান্তি বোধ করেনি—অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়নি।

অরুণা মা তাকে ভর্তি করে দিয়েছিল গ্রাম সেবিকা ট্রেনিং সেণ্টারে। জায়গাটা কোথায় তা জয়া লিখতে বোধ হয় ভুলে গেছে।

জয়া লিখেছে চিঠিতে রয়েছে—"এসে ভর্তি হয়েছিলাম অষ্টম শ্রেণীতে। মা আমাকে সব দিক থেকে সাহায্য করেছিলেন পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে।"

জীবনে সেই দিনটিই তার শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন। জগতের দুয়ার খুলল তার কাছে। সম্মুখে তার রাজপথ চলে গেছে সোজা দিগন্ত পর্যন্ত। চল—চল—চল। এগিয়ে চল!

মনে হয়েছিল জয় করেছে সে সব বাধা বন্ধ। এবার দৌড়ুতে হবে। ছুটতে হবে। ওই দিগন্ত পর্যন্ত যদি যেতে হয়—তবে প্রাণপণে ছুটতে হবে। পথে দেখা হবে তার সঙ্গে। ঐ বৃদ্ধা যার কথা বলেছে—তার সঙ্গে। বৃদ্ধার কথাগুলি গুঞ্জন করে উঠেছিল তার মনের মধ্যে।

ট্রেনিং সেণ্টারে বসে চরকা কাটত; চরকা একটানা ঘরঘর গান গাইত—যেন বলত—সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। তার সঙ্গে বাজত তরুণীদের খিল খিল হাসি।

মন বলত দেখা হবে, হবে দেখা তার সঙ্গে, পথে হবে দেখা? এই দেশের সেবিকা হয়ে চলবে তুমি কাজের পথে—গ্রামে গ্রামে; বন্যায় আর্তিতে তুমি চলবে সেবা করতে হঠাৎ পথে দেখা হবে। সে আসবে বন্যার্ত মানুষকে ত্রাণ করতে। সবল হাতে নৌকার লগি ঠেলে নৌকা নিয়ে হাতের পেশী ফুলে উঠেছে, মাথার রুক্ষু লম্বা চুল বাতাসে উড়ছে। কাঁধের উত্তরীয়খানা পায়ের তলায় পড়ে আছে, নৌকা কিনারায় লাগিয়ে নৌকার আর্ত মানুষগুলিকে নামিয়ে দিযে তার কাছে এসে হেসে বলবে—নমস্কার।

সে আরক্ত মুখে বলবে—নমস্কার।

সে বলবে—একটু জল খাওয়াতে পারবেন। ভাণ্ডার তো আপনার হাতে।

সে তাকে কিছু খাদ্য সমেত জল এনে দেবে।

সে বলবে—এই তো! এই জন্যেই তো আপনাদের বলে অন্নপূর্ণা।

এক বুড়ি—ওই বন্যার্ত দলের মধ্য থেকে বলে উঠবে—তা বাবা তোমরা দুটিতে অন্নপুন্নো মূর্তিতেই দাঁড়িয়েছ গো। আঃ বাবা শিব লইলে বাঁচায় কে ? আর অন্নপুন্নো মা লইলে অন্ন দেয় কে ?

এ ওর দিক তাকিয়ে মুখ নামাবে—ও ও তাই করবে। কিন্তু অন্তর ভ্রমর গুঞ্জনে ভরে উঠবে। চরকায় বেজে চলত সেই ভ্রমর গুঞ্জন।

চরকা থামত, ওদিকে ঘণ্টা পড়ত। কল্পনায় ছেদ পড়ত। ঘণ্টাটাই যেন বলত—না—না—না। চরকা রেখে কল্পনা বিলাস ঝেড়ে ফেলে—সে অন্য কর্তব্যে চলে যেত। পড়া—শিক্ষা।

এ দেশের অগণিত মানুষ শিক্ষায় বঞ্চিত। শতকরা শিক্ষার হার মাত্র ২৩।১৪।

দুঃখ দৈন্যের শেষ নেই, দুর্গতির সীমা নেই, কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। শত শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজ। বর্ণ ভেদে জাতি ভেদে জর্জরিত।

তার মধ্যে অন্য কল্পনা জাগত। সারাটা জীবন সেবা করে যাবে মানুষের। মানুষকে সত্যকারের মানুষ করবে। ভাইকে এনে কাছে রাখবে, লেখাপড়া শেখাবে। তাকেও দেশের সেবায় ব্রতী করবে। তার মত ছোট গ্রাম সেবিকা নয়—দেশের একজন বড় সেবক করবে। সায়েন্স পড়াবে। সায়েন্টিষ্ট হবে দীপু। বড় বড় রিসার্চ করবে। মোটা মাইনে পাবে। তার ঘর হবে—সংসার হবে। সেই তার বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসবে। সেই হবে সে ঘরে কর্ত্রী। —গ্রাম সেবিকার কাজ থেকে আরও বড় কাজ বেছে নেবে সে তখন।

দুটো বছর কেটে গেল।

উজ্জ্বল আলোয় ভরা তার প্রতিটি দিন। আশার উৎসাহের আলোক দীপ্তিতে ঝলমল করেছে।

এরপর আমার নিজের ভাষায় জয়ার জীবন প্রকাশ করব না।

তার লেখা ঘটনাগুলিকে নিজের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে মেজে ঘষে ধরব না। হুবহু জয়ার লেখা কথাগুলিই তুলে দেব। তাতে উপন্যাস সাহিত্যের বিন্যাস ক্ষুণ্ণ হয় হোক। পাঠক মার্জনা করবেন।

জয়া লিখেছে—চিঠিতে রয়েছে—

"সেই পেয়েছিলাম জীবনের অপূর্ব স্বাদ। গত বছর পায়ে হেঁটে মেয়েদের সঙ্গে দূর দূরান্তরে গিয়েছি বন্যার্তদের সেবা ও সাহায্যের জন্য। মনে কত আশা—নিজে মানুষ হয়ে ভাইকে মানুষ করব। চিরদিন চরকা কেটে খদ্দর পরব। আমার এই বন্ধনহীন জীবনটাকে বিলিয়ে দেব দেশের কাজে। তার মধ্যে দিয়ে দেশের আশীর্বাদে যদি বন্ধন আসে—পরব। কিন্তু— ।

আবার উঠল আমার জীবনে ঝড়। পরীক্ষা কাছে এসে পড়েছিল। খুব পড়ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ শুরু হল সর্দি কাশি। খুব অসুস্থ শরীর নিয়েই পরীক্ষা দিলাম।

পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার কবলাম। শরীর সুস্থ থাকলে প্রথম হতাম নিশ্চয়। মাস্টাররাও তা বললেন।

দুদিন পর রাত্রে খেতে বসেছি; ঠাকুরের স্তব পাঠ শেষ করে ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে তুলতে গিয়েছি—এমন সময় এল খুক করে একটা কাশি—সঙ্গে সঙ্গে মুখটা 'বে-আস্বাদে' বিস্বাদ হয়ে গেল—গরম একটা তরল পদার্থে মুখটা ভরে গেল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কি এটা। রক্ত। হ্যাঁ রক্ত। আমি জানি এর স্বাদ। আমি জানি। ভয়ার্ত হয়ে আসন থেকে উঠে—ছুটে পালিয়ে এলাম নিজের ঘরে। মুখের বস্তুটা—উগলে ফেললাম—রক্ত রক্ত, টকটকে রাঙা তাজা রক্ত!

তারপর সাতদিন ক্রমাগত আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল সে প্রায় রক্তের বান।"

জয়া জন্মেছিল দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে। এ ছাড়া তো কোন ব্যাখ্যাই হয় না। যাঁরা ইতিহাসবিদ যাঁরা রাজনীতিজ্ঞ তারা বলবেন

ইতিহাসের বলি। বামপন্থী চরম দক্ষিণপন্থীরাও তাই বলবেন একটু ইতর বিশেষ ক'রে, দোষ দেবেন দেশ বিভাগে যারা সম্মত হয়েছে তাদের ওপর। গণবিপ্লব না ক'রে আপোষে যারা স্বাধীনতা নিয়েছে দায়ী তারা। আমি ভাবছি তার দুর্ভাগ্যের কথা। দোষ যার হোক দায় যার হোক দুর্ভাগ্য যে তার চরম তাতে সন্দেহ নেই। এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে একটি সৌভাগ্যের রজত রেখা তার সাধনায় পুণ্য বলেই ঝিকমিক করছে। এই মন্দ পৃথিবীতে ভালো মানুষেব দেখা পেয়েছে ; মন্দ মানুষও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে।

এখানে ওই দেশসেবক শ্রীচৌধুরী আর তাঁর স্ত্রী—জয়ার অরুণা-মা সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিলেন চন্দ্রকোণা থেকে। জয়া তখন রক্তক্ষরণে শীর্ণাঙ্গী এবং পাণ্ডুর হয়ে গেছে। গায়ে তার উত্তাপ ফুটেছে।

স্বপ্নে সে মাকে দেখে—বাবাকে দেখে। অরুণা মা তাকে দেখে শিউরে উঠে কপালে হাত দিয়ে বলেছিলেন—এ কি চেহারা হয়েছে জয়া ?

জয়ার মুখে শুধু একটি শীর্ণ হাসি ফুটেছিল।

সে বলেছিল—আমি বাঁচব না ?—বাঁচতে সে চেয়েছিল—বাঁচতে চায়।

চৌধুরী বলেছিলেন—বাঁচবে বই কি। আজকাল টি. বি-র অনেক ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। স্বতন্ত্র হাসপাতাল রয়েছে। ভয় কি ? আমি ব্যবস্থা করছি।

হাজার হাজার টি. বি. রোগী আজ হাসপাতালে আশ্রয়াভাবে ভুগছে, মরছে, সেখানে জয়া, পিতৃহীনা মাতৃহীনা বন্ধুহীনা স্বজনহীনা জয়া আশ্রয় পেল চৌধুরী মশায়ের চেষ্টায়। আপনার সাধনায় এই পৃথিবী তাদের স্নেহটুকু অর্জন করেছিল।

জয়া চিঠিতে লিখেছে—আমার পরিণাম দেখে অরুণা মা, চৌধুরী মেসোমশায় পেলেন মর্মান্তিক আঘাত। তাঁরা সাত দিনের মধ্যে চেষ্টা ক'রে ডিগরী স্যানাটেরিয়ামে আমার জন্যে ফ্রি বেড ক'রে দিলেন।

তাঁরা সত্যই মহৎ মানুষ, সত্যকারের দেশসেবক। প্রথম প্রথম তাঁরা আমাকে দেখতে এসেছেন। আর্থিক সাহায্য করেছেন। তাঁদের মত পরোপকারী মহৎ মানুষের জন্য আমার অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি আন্তরিক অকৃত্রিম।

মজুমদার সাহেব সুরমাদি এঁদের অপরাধ অনেক। কিন্তু দেখেছি তাঁদের মধ্যেও তাঁদের অপরাধের কীর্তিনাশার ধারার সমান্তরালে ভাগিরথীর ধারার মতও একটি ধারা আছে। আমি তাতে স্নান ক'রেই কীর্তিনাশার ধ্বংস স্রোত থেকে রক্ষা পেয়েছি।

দীর্ঘ আট মাস ধরে এই মৃত্যু-রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছি। আমি বাঁচতে চাই। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে দেখব আমি শেষ পর্যন্ত। আমার ভাগ্যের দোষ—পৃথিবীকে দোষ দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পারি না। নইলে আমার ভাই এমন করবে কেন?

দু মাস আগে খবর এসেছে, চিঠি পেয়েছি অনাথ-আশ্রম থেকে—আমার ভাই সেখান থেকে পালিয়েছে।

তারা যাই লিখুক—আমি জানি সে কেন সেই দোতলা সমান পাঁচিল ডিঙিয়ে এই অচেনা পৃথিবীর অন্ধকার পথে নেমে এসেছে—হারিয়েছে। সে তার দিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছে। উৎকণ্ঠা তার আর সহ্য হয়নি। জানি না সে বেঁচে আছে কিনা। থাকলেও আমার কল্পনায় যা দেখি—তাতে শিউরে উঠি। শিউরে উঠি আর বলি, তাই যদি হয়ে থাকে তবে ভগবান তুমি তাকে টেনে নিয়ো—টেনে নিয়ো। আমি কল্পনায় দেখি—কলকাতার পথের ভিক্ষুকদের সঙ্গে সে মিশে গেছে। হাত পেতে চাচ্ছে—দুটো পয়সা দেবেন, বাবু—কিছু খাই নি। বাবু! অথবা উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাচ্ছে। কোন পুলের তলায় বাসা নিয়েছে অসংখ্য ভিক্ষুকদের সঙ্গে। কিম্বা হয়তো অপরাধীর দলে পড়ে পথে পথে ঘুরছে পথের পথিকদের ভারী পকেট খুঁজে-খুঁজে।

আজ এই কুড়ি বছরের জীবনে—আমি নায়কহীন নায়িকা। হয় তো তাই হয়েই আমার জীবন-নাটকে যবনিকা নামবে।

আপনার মহাশ্বেতা বই পড়ে আজও মনে সাধ—আমি নায়িকা নীরার মত হব। সংগ্রাম করে জিতব। ভাগ্যকে ফেরাব। তার অঙ্গ থেকে দুঃখের ছাপ-মারা পরিচ্ছদ খুলে উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরাব।

আবার ভয় হচ্ছে, তা হবে না। আমাকে বিশ্বনাটকে অসম্পূর্ণ চরিত্র হিসেবে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন—আমাকে তাই চলে যেতে হবে।

তাই আপনার কাছে আমার রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েই এই কাহিনীটুকু লিখে পাঠালাম। আপনি লিখবেন। উপন্যাস না হয় ছোট-গল্প, তাই লিখবেন। আমার বড় সাধ।

এরই নিচে লেখা—সমাপ্ত।

সমাপ্ত ওখানে নয়। এর পরও আছে। সুতপা বা সুরূপার কাহিনী যেমন আজও শেষ হয়নি—জয়ার কাহিনীও ওখানে শেষ হয় নি। আমি চিঠি লিখেছিলাম জয়াকে—সান্ত্বনা দিয়ে। লিখেছিলাম, "জয়া,আমি আশীর্ব্বাদ করছি—তুমি ভাল হয়ে উঠবে। সংসারে—তুমি ঠিক লিখেছ জয়া—ভাল মানুষ আছে মন্দ মানুষ আছে, ভালয় মন্দয় মেশানো সাধারণ মানুষ আছে—তারাই বেশী। তোমার সাধনায় তুমি মন্দ মানুষের ভিতর থেকে ভাল মানুষের ঘুম ভাঙিয়েছ; তোমার বিরুদ্ধে তোমার দুর্ভাগ্যের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে—পার হয়ে এসেছ। অনাত্মীয়ের মধ্য থেকে আত্মীয়কে আবিষ্কার করেছ। আপনজন তুমি পেয়েছ—পাবে। আমিও আজ থেকে তোমার আপন-জন হলাম। তোমার জীবনী আমি পেয়েছি। যত্ন করে রেখে দিলাম। তুমি লিখেছ সমাপ্ত—আমি সেটা কেটে দিয়েছি। প্রতীক্ষা ক'রে রইলাম—উপযুক্ত সমাপ্তির ছেদের জন্য। লিখব—তোমার জীবনী আমি লিখব।"

সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার ডাক্তারকে পত্র লিখলাম জয়ার অবস্থা সঠিক কি—তা জানাবার জন্য। চিঠির জয়ার সঙ্গে—আসল জয়ার তফাৎ আছে কিনা সে প্রশ্নও করলাম।

জয়ার একখানা উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা ভরা পত্র পেলাম। ডাক্তার লিখলেন—মেয়েটি বড় ভাল। তবে ভাবপ্রবণ। সেটার জন্যই ও নিজে যেন ভাল হতে চাচ্ছে না। বিশেষ ক'রে ওই এক ভাই ছিল, তার নিরুদ্দেশের খবর পাওয়া অবধি মুসড়ে পড়েছে। অসুখকে চাচ্ছে। তবুও ওকে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্যোত্তর স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠাতে পারব বলেই মনে করি।

এর পরও আছে।

কিছুদিন পর একখানা চিঠি এল জয়ার। হস্তাক্ষরটা মনে ছিল। তাই উল্টে নামটা দেখলাম প্রথমেই। দেখলাম জয়াই বটে। এবার লিখেছে এম, আর, বাসুর স্যানাটোরিয়াম থেকে। ওয়ার্ড—পি-ও, বেড নম্বর ছয়। আরোগ্যোত্তর স্বাস্থ্যাবাস।

মস্ত লম্বা চিঠি। এক কথার পুনরাবৃত্তি বারবার। দাদা সম্বোধন করে লিখেছে—আপনার দুখানা চিঠি এবং একখানা পাঠানো বই পেয়েছিলাম আমি। আমি সেই যক্ষ্মা-রোগিনী জয়া। আপনার সেই আশার কথা ভরা চিঠি দুখানা থেকে আমি আশ্চর্য বল পেয়েছিলাম দাদা। আমি বাঁচতে চাওয়ার মধ্যে জোর পেয়েছিলাম। নতুন করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা এনে দিয়েছিল আমার মধ্যে। বর্তমানে আমি walking Patient ; ডাক্তার গাঙ্গুলী বলেছেন, তুমি কিছু দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে। একটা অপারেশন দরকার হয়, সেটাও দরকার হবে না। কিন্তু সেদিন মেডিকেল বোর্ড এসেছিল--তারা বলেছে—অপারেশন করতে হবে। এবং তাতে কোনই ভয় নেই। শীঘ্র অপারেশনের ব্যবস্থা করবেন।

ভয়? দাদা অপারেশন করতে আমার একটুও ভয় নেই। আমার অপারেশন আমি চাই। আমি ভাল হয়ে উঠব। আবার লড়াই সুরু করব দুর্ভাগ্যের সঙ্গে। আমি জিতব।

সব থেকে আনন্দ আমার—আমার হারানো ভাই ফিরেছে।

কৃষ্ণনগরের দু'জন অপরিচিত ভদ্রলোক তাকে সেখানে পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে—আমাকে তার খবর দিয়েছিলেন। আমি চিঠি লিখেছিলাম কাকাকে। সেই সন্ন্যাসী কাকা। কাকীমা মারা গেছেন। কাকার মাথা ভাল হলেও উদাসী। কিন্তু তাঁকে ছাড়া আর লিখবই বা কাকে। কাকা তাকে নিয়ে গেছেন। সেখানে সে আছে। কিন্তু বুঝতে পারি বড় কষ্টেই আছে।

আমি এখন লিখবার চেষ্টা করি। কিছু হয় না। লজ্জা পাই। আমার জীবন নিয়ে কখন লিখবেন দাদা? এখনও সময় হয় নি?

আমি লিখেছিলাম—না, এখনও সময় হয় নি।

আবার চিঠি পেলাম বেশ কিছুদিন পর। এবার ঠিকানা নীলরতন সরকার হাসপাতাল, ফ্রেজার বি ওয়ার্ড বেড নং ২। কলিকাতা-১৪। দাদা, আমি নীলরতন সরকার হাসপাতালে অপারেশনের জন্য এসেছি। অপারেশন ছাড়া আমি ভাল ঠিক হব না। এখানকার চেষ্ট সার্জন ডাঃ চ্যাটার্জী—ওখানে গিয়ে আমার কেস সম্পূর্ণ রেডি কেস দেখে এখানে অপারেশনের জন্য এনেছেন।

খুব তাড়াতাড়ি অপারেশন হবে আমার। তার আগে যে নানান পরীক্ষা আছে তাই হচ্ছে। সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব কিনা জানি না। কি রকম সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আগে বলেছি কতজনকে, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না—কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটা অনুভূতি হচ্ছে—ভয় আছে তার মধ্যে।

আমি যদি মারা যাই, আমার জীবন নিয়ে বই লিখতে যেন ভুলবেন না। সে বই আমার পড়া হবে না—চোখে দেখা হবে না। তবু এই অখ্যাত জীবনের কাহিনী আপনার মানস সরোবরে স্নান করে মানুষের কাছে পৌঁছুবে—তারা জানবে—জয়া বলে দুর্ভাগিনী একটি মেয়ে ছিল—যে হার না মেনে মরেছে। এতেই আমি ধন্য হব।

এ চিঠি যখন পাই তখন আমি নিজে অসুস্থ শয্যাশায়ী। আমার বড় জামাই, আমার সংসারের উজ্জ্বলতম রত্ন—ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে

হাসপাতালে। আমার দৌহিত্র—বড় মেয়েরই একটি পুত্র—তার নেফ্রাইটিস। এর মধ্যে কত দিন ইচ্ছা করেছি, জয়াকে দেখে আসব। কিন্তু পারি নি—সময় করতে পারি নি, সম্ভবত মনের দিক থেকেই সময় হয় নি।

জয়া ক্ষুব্ধ নিশ্চয় হয়েছিল। হবারই কথা। আমি চিঠিতে লিখেছিলাম আমাকে আপনজন মনে করো। সে তা করেছিল, চিঠিতে তার পরিচয় আছে। আমিই প্রমাণ দিয়েছিলাম, আমি সত্য করে আপনজন হই নি, হতে পারিনি। দুঃখ সে পাবে বই কি।

আরও কিছুদিন পর—তখন আমার জামাই প্রায় শেষ-যাত্রার জন্য সেজেছে—তার মৃত্যুর দশ বারো দিন আগে আবার চিঠি পেলাম জয়ার।

সব ঠিক হয়েও জয়ার অপারেশন হয়নি। তার গ্রুপের রক্ত পাওয়া যায় নি। চমকে উঠেছিলাম।

দুর্ভাগ্যের চক্রান্ত কি এমন নিষ্ঠুর অলঙ্ঘনীয় হয়, যার জন্য মানুষের সব চেষ্টা হার মানে?

না, ভুল বললাম। সেই চেষ্টাটাই হয় নি। যে চেষ্টায় এ রক্ত সংগ্রহ করা যেতে পারত, দেশ থেকে হোক দেশান্তর থেকেই হোক—সে চেষ্টা হয় নি। এ দেশে সে প্রাণ, সে প্রেম, সে চেতনা নেই।

আপন শিয়রে দুর্ভাগ্যের উদ্যত বজ্রপাতের আতঙ্ককে মুহূর্তের জন্য সরিয়ে রেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম। এরই মধ্যে আর একটা খবর ছিল জয়ার। সে তার মামীমার দেখা পেয়েছে। যে বড়লোক মামারা তাকে উপেক্ষা করেছিলেন, তাঁদেরই একজনের স্ত্রী। তিনি স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছেন তাঁর সন্তানতুল্য একজনের কাছে। তাঁরা বেলেঘাটায় থাকেন। দেখা হয়েছে আকস্মিক ভাবে *হাসপাতালে।*

আরও খবর ডাক্তারেরা বলেছে—অপারেশন না হলেও সাবধানে থাকলে টি. বি. চাপাই থাকবে—কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

সম্ভবত চলে যাবে সে মামীর কাছে। মামী তাকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ চিঠির উত্তর দিতে পারিনি।

দশ বারো দিন পর আমার জামাই মারা গেলেন। মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। ওদিকে নাতিটির অসুখ প্রবল হয়ে উঠেছিল। লড়াই চলছিল তাকে নিয়ে।

মাস তিনেক পর—সে যখন একটু সুস্থ হয়েছে, তখন আমি পড়লাম কঠিন অসুখে। দিল্লী থেকে আসবার পথে ট্রেনে অসুস্থ হয়ে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় পৌঁছুলাম হাওড়ায়। তারপর ছ'মাস শয্যাশায়ী।

এই অবস্থাতেই একখানা চিঠি এল জয়ার। পোষ্টকার্ডখানায় তার মামীর বাড়ির ঠিকানা পেলাম। জবাব দিলাম তার। অবসর অনেক তখন হাতে। কাজকর্ম নিষেধ। চলাফেরা বারণ।

কদিন পর জয়ার চিঠি এল। দীর্ঘ চিঠি। চিঠি পড়ে শিউরে উঠলাম।

দাদা, কদিন আগে অভাবনীয় ভাবে আপনার চিঠি পেলাম। আপনার চিঠি পেলে মনে হয় যেন আমি কি বিরাট একটা জিনিষ লাভ করেছি।

দাদা নতুন ঝড় উঠেছে জীবনে। সাইক্লোন টাইফুনের মত। দিনে রাত্রে মনের দিক থেকে সময় নেই। এ ঝড়ের কথা লিখতে কলম সরে না—মুখে কাউকে বলা যায় না; কিন্তু তবু আপনাকে না লিখে পারছি না। আমার জীবনের উপাদান যে আমাকে আপনার হাতে দিয়ে যেতে হবে। যেতেই হবে। আমাকে নিয়ে যে আপনি লিখবেন। আমার যে তাতে বড় আকাঙ্ক্ষা।

এখন রাত্রি দশটা। সব কথা লিখতে যে কটা বাজবে জানি না। হয় তো রাত্রি শেষ হয়ে যাবে। আর আপনাকে না লিখে যে শান্তি পাচ্ছি না।

অথচ এ কথা আপনাকে লেখা যায় না। বোধ হয় একমাত্র 'মা' ছাড়া আর কারও কাছে বলা যায় না।

আপনাকে লিখেছিলাম—আমি মামীমার কাছে এসেছি। মামীমা থাকেন তাঁর পালিত সন্তানের কাছে। এই পালিত ছেলে এখন চাকরি করে। ছেলে তাঁকে সমাদরে স্থান দিয়েছে। আমাকে মামী স্থান দিলেন ঘরে—তাঁর পালিত ছেলে হেসে বললে, বেশ তো!

আমার জীবনের কথায় বোধ হয় লিখি নি—এক সময় তখন আমার বয়স অনেক কম—তখন কাকার কাছে কলকাতায় থাকতাম। কাকা এই ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। বিয়ে হয়েও হয়ত যেতো। কিন্তু কাকা তারপরই পাগল হয়ে গেলেন।

এখানে এসে তাঁকে দাদা বলে প্রণাম করলাম। তিনি সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন। ভরসা দিলেন, ডাক্তারের কাছে তিনি শুনে এসেছেন—না হোক অপারেশন—কোন ক্ষতি নেই। রোগ বলতে গেলে সেরেই গেছে। অপারেশন প্রয়োজন—খুব দূর আশঙ্কার জন্য শতকরা দুটো চারটেতে হয় যে অপারেশন না হলে আবার রোগ দেখা দেয়—দুরন্ত অনিয়ম অত্যাচারে।

তাঁকে আবার প্রণাম করলাম। মনের আনন্দে ছিলাম। চেষ্টা করছিলাম—সুস্থ হয়েছি, এবার চাকরি খুঁজব। খুঁজছিলাম। দাদা খুব সহানুভূতির সঙ্গে দরখাস্ত দেখে দেন। তিনি চাকরি করেন রেলে। বাইরে যেতে হয়। যখন আসেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজ নেন।

মামীমা একদিন তাকে বলেছিলেন—এক সময় তো তোর সঙ্গে জয়ার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—এখন ও এক রকম ভাল হয়েই গেছে। এবার তুই ওকে বিয়ে কর না রে।

আমি শিউরে উঠে বলেছিলাম—না মামীমা, না। আমার দুর্ভাগ্য আমার থাক—তার ছোঁয়াচ লাগলে ওর হয়তো অনিষ্ট হবে।

তিনিও বলেছিলেন—জয়া ঠিক বলেছে মা। বিয়ে ওর না-করাই ভাল। তা ছাড়া বিয়ে করতে হলে আরও একটু লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করব আমি। যে চাকরি ক'রে সাহায্য করতে পারবে সংসারে।

এই কয়েক দিন আগে পর্য্যন্ত আমার জীবন ছিল নিশ্চিন্ত—রাত্রে সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। খবর পেয়েছি, ভাই ভাল হয়েছে—কারখানায় কাজ শিখছে। তার সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি আমি।

আপনাকে আগের চিঠি লেখার দু-তিন দিন পর পর্যন্তও আমার নিশ্চিন্ত সুন্দর সুসময় গেছে। হঠাৎ সব পাল্টে গেল—উল্টে গেল। সাদা কালো হয়ে গেল। রাত্রি দুর্যোগে ভরে উঠল। যেন—সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র পৃথিবীর আলো জোনাকীর দীপ্তি সব মুছে গিয়ে হয়ে গেল ভয়াল অন্ধকার।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আমার ভীষণ ঘুম। আমাদের মাত্র একখানা ঘর। একটা বড় মশারির মধ্যে আমরা সকলে শুই। ঘুম ভেঙে মনে হল কার নিশ্বাস পড়ছে আমার গায়ে। গায়ে যেন স্পর্শ অনুভব করি—অত্যন্ত লঘু স্পর্শ। অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে দেখি দুটো চোখ আমার দিকে চেয়ে আছে।

থর থর করে উঠল সমস্ত ভিতরটা। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম না কি করব?

চীৎকার করব? ফিস্ ফিস্ করে বলব—সরে যান—সরে যান। কিছুই পারলাম না। শুধু পাশ ফিরে শুলাম। মুখে যেন ঘুমের ঘোরে বললাম—ঠাকুর!

কাজ হল। সন্তর্পণে সরে গেলেন ওপাশে নিজের জায়গায়। তিনি শুলেন। আমি যেন ঘুম ভেঙে উঠে জল খেলাম। তারপর কাতরাতে লাগলাম—মধ্যে মধ্যে। তিনি বুঝলেন আমি জেনেছি—দেখেছি। আমি সারারাত জেগে রইলাম।

পরদিন রাত্রে দীর্ঘক্ষণ জেগে রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়েছিলাম। আবার ঘুম ভাঙল--মশারিতে টান পড়ে। চোখ মেললাম। মশারির ওপারে মানুষের ছায়া। আমি নড়ে চড়ে জানান দিলাম—আমি জেগে আছি। মামীমার কাছ ঘেঁসে গেলাম। সরে গেলেন তিনি।

পরদিন আবার! এ দিন আমি একবারও ঘুমুই নি। দেখলাম

তিনি মধ্যে মধ্যে উঠছেন, কিন্তু আমাকে 'জাগন্ত' দেখে আবার ঘুমের ভান করছেন। সেটা ছিল গত-কাল।

আজ সকালে উঠে মনকে বেঁধে ফেললাম। আমি বুঝেছি ওই মানুষটি দিনে ভাল—কিন্তু রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে হার মানেন অন্তরের পশুর কাছে। অসহায় হয়ে যান। কিন্তু আমি উপায়হীনা। আমি জীবনে সংকল্প তো বিচ্যুত হব না। মামীমাকে বললাম। মামীমা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন—হতেই পারে না। তবু তিনি তাঁকে ডেকে বললেন—জয়া এইসব কথা বলছে তোর নামে? এ সত্যি?

মুহূর্তে তিনি যে কাণ্ড করলেন, আমি তা কোনদিন ভাবতেও পারতাম না। মামীমার পায়ের কাছে ব'সে তাঁব পায়ে হাত দিয়ে বললেন—তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি মা—এর আমি কিছুই জানি না।

মামীমা বললেন—জয়া!

তিনিই বললেন—ওকে বকছ কেন মা—ও ওর সম্পূর্ণ ভ্রম। ও স্বপ্ন দেখেছে বলেই আমার বিশ্বাস! মা, এই বয়স—এমন হওয়া স্বাভাবিক।

আমি পাথর হয়ে গেলাম দাদা—মনে হল নরকে নেমে যাচ্ছি। পাপ আমার মনের পাপ, পাপ আমার স্বপ্নের পাপ, অন্তরে অন্তরে আমি পাপী—আমি পাপী—আমি পাপী।

এর থেকে কুৎসিৎ আর কিছু হতে পারে দাদা? মরা উচিত এরপর আমার মরা উচিত। নয় কি? কিন্তু আমি মরব না। হার আমি মানব না। আমি এবার এ আশ্রয় ছেড়ে পথে হাঁটব। কোথায় তা জানি না। যেমন করে হোক—যেখানে হোক আমি আমার কাজ যোগাড় করে নেব—চলব আমার সংকল্পের পথে চলব। হয় জিতব। নয় মরব। জিতলে একদিন আপনার কাছে এসে দাঁড়াব। আর চিঠি পাবেন না। তবে আমার জীবন নিয়ে যেন বই লিখবেন। আমি কাল সকালে বের হয়ে পড়ব। ইতি—

জয়া।

এই জয়ার শেষ চিঠি।

চিঠিগুলি রেখেই দিয়েছিলাম। সুতপা অর্থাৎ সুরূপার বিচিত্র জীবন-কথা লেখা খাতাখানার খানিকটা পড়তে পড়তে মনে পড়ল জয়াকে। মনের সৃষ্টির সম্মুখে রূপসী সুরূপাকে আড়াল করে এসে একটি শ্যামবর্ণ সাদাসিদে মেয়ে।

তবে ভাল লাগছে কল্পনা করতে তার চোখ দুটি ডাগর। মাথায় চুল আছে অনেক। একটু দীর্ঘাঙ্গী।

সে বললে—সুরূপার জীবন নিয়ে লিখবেন ভাবছেন। আমার কথা? লিখবেন না? আমি জয়া! আমি জানি আমার জীবন আপনাদের সাহিত্যের দরবারে রুচিকর হবে না; বলবেন, হয়তো, আমার জীবন শুক্‌নো। আমার জীবনে প্রেম নেই। আমার জীবনে আমার স্বেচ্ছায় বরণ করা দুঃখ। এ দুঃখে যে জল চোখে আসবে— যদিই আসে সে জল, দুঃখের সূচ ফুটিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে বের করা জল? আজ হয়তো আমার সংজ্ঞাই হবে অস্বাভাবিক! তবু লিখবেন। ক্ষতি কি। না হয়—ছুঁড়ে ফেলেই দেবে রসিক জনে! আমরা মানে আমার মত একগুঁয়ে মেয়েরা তো কোন কালেই শেষ হবে না। কোনকালেই শেষ হবে না। কোন কালে না। রাজ্যসম্পদের লোভেও না। মরণের ভয়েও না।

আমি তাই লিখলাম।

লিখে নিয়ে গেলাম তো সুতপার কাছে। সুতপা আমার হাতে খাতা দেখে সাগ্রহে বললে—লেখা হয়ে গেছে?

বললাম—না সুতপা। অন্য একটা। আর একটি মেয়ের। তারও যক্ষ্মা হয়েছিল। তারটা লিখেছি—তার কাছে আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল। দেখ তো কেমন লাগে? তোমারটা পরে লিখব।

সুতপা খাতাখানা খুলে পড়তে লাগল। বললাম—পড়। কাল আসব।

পরের দিন গেলাম। দেখলাম। দেখলাম, সুতপা খাতাখানা হাতে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

বললাম—পড়েছ ?

বললে—দুবার পড়েছি।

—তারপর ?

—তারপর ! আগে শেষ করুন । পথে বের করে দিলেন—এ কি শেষ হ'ল ?

আর তো জানি না। কারণ এ তো কল্পনা নয়—এব যে প্রতিটি ছত্র সত্য।

—তবু কল্পনা করুন পথে চলতে চলতে সে দেখা পেলে তার জন্মজন্মান্তরের—হ্যাঁ তা ভিন্ন কি বলব ? হ্যাঁ—বলা যায় তার বাঞ্ছিত জনের—যাকে প্রথমে দেখেই ভাল লাগে। তার সঙ্গে মিলে সে এসেছে আপনাকে প্রণাম করতে।

ঘাড় নাড়লাম।—না। কল্পনা করতে ভাল লাগছে—শেষ-শয্যায় শুয়ে আছে জয়া। আমি খবর পেয়ে গেছি। সে হেসে বলছে—আমি মরছি—কিন্তু আমি হারিনি।

সুতপা বললে—আমাব জয়া হতে ইচ্ছে করছে।

বললাম—তাহলে যদি মরতে মরতে জয়া বলে আমাব আপশোষ হচ্ছে দাদা—

কেন আমি সুতপা হইনি।

সুতপা বললে—না! না!

বললাম—কেন ?

সে বললে—জানি না।